নায়ক নারী নিয়তি

সিন্ধুবাদ

গ্রন্থপ্রকাশ

৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৫১

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
৫-১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
মন্মথনাথ পান
কে. এম. প্রেস
১।১, দীনবন্ধু লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ—সুধীর মৈত্র

চার টাকা

শ্রীযুক্ত সুবোধ ঘোষ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই বইয়ের অধিকাংশ লেখাই প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায়; অল্প কয়েকটি অন্যত্র। বিভিন্ন ঘটনা কিংবা চরিত্রের কথা লিখতে গিয়ে দেশী-বিদেশী নানা পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি, ভূমিকায় তার স্বীকৃতি রইল।

—গ্রন্থকার

বিষকন্যা

দেশের কাছে, দলের কাছে, দশের কাছে ভীষণভাবে ছোট হয়ে গিয়েও কি জীবনকে আবার নতুনভাবে শুরু করা যায়? পরাস্ত, অপদস্থ রাজনীতিক কি আরার শুরুর থেকে তাঁর জীবন শুরু করতে পারেন?

প্রশ্নটার উত্তর পরে দেব। তার আগে বরং কয়েকটা মাস পিছিয়ে যাওয়া যাক; উঁকি দেওয়া যাক ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কমন্স-সভায়। ১৯৩৩ সনের ২২শে মার্চ। ব্রিটেনের একজন প্রখ্যাত রাজনীতিক সেদিন কমন্স-সভায় একটি বিবৃতি পাঠ করছিলেন।

"মিস্ কীলার নিখোঁজ হয়েছেন, এবং এই নিখোঁজ হবার ব্যাপারটার সঙ্গে আমার নামকে অনেকে জড়িয়ে দিতে চাইছেন।

"এই সুযোগে এ-সম্পর্কে আমি এখানে কিছু বলতে চাই।

"মিস্ কীলারকে আমি শেষ দেখেছি ১৯৬১ সনের ডিসেম্বর মাসে। তার পরে আর তাঁকে আমি দেখিনি। তিনি এখন কোথায় আছেন, আমি জানি না। ওল্ড বেলিতে যে মামলা চলছে, তার শুনানির সময়ে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু এমন কথা যদি বলা হয় যে, এই নিরুদ্দেশ হবার ঘটনাটার সঙ্গে আমার যোগসাজশ আছে কিংবা আমিই এর জন্য দায়ী, তাহলে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলা হবে।

"১৯৩৬ সনের জুলাই মাসে, ক্লীভডেনের এক ঘরোয়া পার্টিতে, আমার স্ত্রী আর আমি সর্বপ্রথম মিস্ কীলারকে দেখি। সেই পার্টিতে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডঃ স্টীফেন ওয়ার্ড এবং জনৈক মিঃ আইভানভ। ডঃ ওয়ার্ডের সঙ্গে এর আগেও আমাদের সামান্য পরিচয় ছিল; এবং মিঃ আইভানভ এখানকার রুশ দূতাবাসে কাজ করতেন।

"মিঃ আইভানভকে আমি আর আমার স্ত্রী এর পরে আর মাত্র একবারই দেখেছি। মেজর গাগারিনকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য রুশ দূতাবাসে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে মাত্র এক লহমার জন্য মিঃ আইভানভের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়।

"ডঃ ওয়ার্ড আমাদের আগেই অনুরোধ জানিয়ে রেখেছিলেন, আমরা যেন তাঁর ফ্ল্যাটে যাই।

"১৯৪১ সনের জুলাই থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে, ডঃ ওয়ার্ড আর তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য, বার ছয়েক আমি তাঁর ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম। সেখানে মিস্ কীলারের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। মিস্ কীলারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বের। এই সম্পর্কের মধ্যে এমন কিছু ছিল না, যাকে অসঙ্গত বলা যেতে পারে।"

কমন্স-সভায় যিনি সেদিন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তিনি একজন অখ্যাত এম. পি. নন। বক্তৃতা দিচ্ছিলেন জন প্রোফুমো; ব্রিটিশ সরকারের সমর-মন্ত্রী।

দেখতে সুন্দর, ব্যবহারে চমৎকার, সদালাপী, বন্ধুবৎসল—প্রোফুমোকে নিয়ে টোরি দলের গর্ব নেহাত কম ছিল না। গর্বের একটা প্রধান কারণ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়ঙ্কর দিনগুলিতে রণক্ষেত্রে এই মানুষটি যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা খুব সুলভ নয়। টোরি নেতারা সুতরাং আশা করতেন যে, প্রোফুমো যদি দলে থাকেন, তরুণ-সমাজের অনেকেই তাহলে রক্ষণশীল দলের প্রতি আকৃষ্ট হবেন। প্রোফুমো ছিলেন তাঁদের গ্ল্যামার ম্যান; এমন মানুষ, যাঁকে চুম্বকের মতন কাজে লাগিয়ে আরও অনেককে দলে টানা যায়।

তাঁর স্ত্রী ভ্যালেরি হবসনের আকর্ষণও নেহাত কম ছিল না। সুন্দরী এই মহিলা এককালে অভিনেত্রী ছিলেন। অভিনয় করে খ্যাতি হয়েছিল, পর্দার জগতে ক্রমে-ক্রমে সেই খ্যাতি আরও বাড়তে পারত, কিন্তু শেষপর্যন্ত আর সেখানে তিনি থাকেননি। আগের

বিবাহে বিচ্ছেদ ঘটেছিল, তার পরে তিনি প্রোফুমোর ঘরণী হয়ে এলেন। ইংলণ্ডের উঁচু তলার সমাজে তাঁদের আকর্ষণ ছিল অপ্রতিরোধ্য। তাঁরা এলে পার্টির জলুস বাড়ত; আসরের আনন্দ আরও দীপ্তি পেত। সবাই বলত, সুখী দম্পতি। প্রোফুমো আর ভ্যালেরির মুখের উপরে যে হাসির ছটা দেখতে পেত তারা, তাতে অন্য-কিছু বলা সম্ভব ছিল না। জন প্রোফুমো সুন্দর স্বভাবের মানুষ। পার্টিতেই হোক, আর পার্লামেণ্টেই হোক, কেউ কখনও তাঁকে বিষণ্ণ দেখেনি। প্রায় সব সময়েই তিনি হাসতেন।

কিন্তু সেদিন তিনি হাসছিলেন না। বিষণ্ণ, গম্ভীর, একটু-বা ক্লান্ত গলায় তিনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। চুপ করে সবাই শুনে যাচ্ছিলেন তাঁর কথা। তাঁর পক্ষের এবং বিপক্ষের মানুষরা। সাংবাদিকরা। গ্যালারির দর্শকরা। কমন্স-সভায় যে অদ্ভুত নৈঃশব্দ্য সেদিন নেমে এসেছিল, তাতে কারও হাত থেকে একটা পেনসিল পড়ে গেলেও তার শব্দ শুনে সবাই হয়ত চমকে উঠত।

জন প্রোফুমো বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বলছিলেন যে, তিনি নির্দোষ। বলছিলেন যে, পণ্যা-কন্যা কীলারের নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। বলছিলেন যে, কীলারের সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক ছিল, তা নেহাতই বন্ধুত্বের সম্পর্ক, কামগন্ধ নাহি তায়।

বিবৃতি শেষ হয়ে এসেছিল জন প্রোফুমোর। উপসংহারে পৌঁছে স্পষ্ট চোখে স্পীকারের দিকে তাকালেন তিনি। নিষ্কম্প দৃঢ় গলায় বললেন:

"মিঃ স্পীকার, গতকাল এই সভায় এমন কয়েকটি কথা বলা হয়েছে, যার ফলে আমাকে এই বিবৃতি দিতে হল। কথাগুলি যাঁরা বলেছিলেন, মাননীয় সেই সদস্য তিনজনের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বনের উপায় আমার নেই। কেননা, তাঁদের প্রিভিলেজই তাঁদের রক্ষা করছে। কিন্তু আমি স্পষ্ট করে জানাতে চাই যে, এই সভার

বাইরে যদি এই ধরনের অভিযোগ করা হয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ আমি মানহানির মোকদ্দমা করব।”

জন প্রোফুমোর বিবৃতি শুনে যে প্রধানমন্ত্রী মিঃ হ্যারল্ড ম্যাকমিলান সেদিন খুশী হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। সম্ভবত তিনি ভেবেছিলেন যে, প্রোফুমোর বিরুদ্ধে এর পরে আর কোনও অভিযোগ তুলবার সাহস কারও হবে না, এবং তাঁর সরকারের সুনাম তার ফলে অক্ষুণ্ণ থাকবে।

খুশী হয়েছিলেন রক্ষণশীল দলের অতি-দক্ষিণ সদস্যরাও। তাঁরা ভাবছিলেন যে, এ বেশ মুখের মতন জবাব হল। ব্রিটিশ সরকারের একজন মন্ত্রীর নাম জড়িয়ে যারা কলঙ্ক রটায়, এবারে আর তারা মুখ খুলতে পারবে না।

তাঁরা নিশ্চিন্ত বোধ করছিলেন। তার কারণ, তাঁরা জানতেন না যে, কমন্স-সভায় দাঁড়িয়ে যে-কথা বলেছেন জন প্রোফুমো, তা একেবারে নির্জলা মিথ্যাকথা। তাঁরা জানতেন না যে, নিজেকে বাঁচাবার জন্যে তিনি ভালমানুষের মুখোশ পরেছেন। তাঁরা জানতেন না যে, সেই মুখোশটাকে আর মাত্র কয়েকদিন বাদেই খসিয়ে দেওয়া হবে।

জন প্রোফুমোর মুখোশটাকে যাঁরা খসিয়ে দিতে চাইছিলেন, তাঁরা কারা? খসিয়ে দিতে চাইছিলেন কয়েকজন সাংবাদিক, আর পার্লামেন্টের কয়েকজন সদস্য। এমন কথা ভাববার কোনও কারণ নেই যে, ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা প্রোফুমোর উপরে চটা ছিলেন, এবং সেই কারণে তাঁর চরিত্র-সংহারের চেষ্টা করছিলেন। না, ব্যক্তিগত ঈর্ষা অসূয়া বিদ্বেষ এক্ষেত্রে প্রোফুমো সম্পর্কে তাঁদের বিরূপ করে তোলেনি। আসলে তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার খাতিরেই প্রোফুমোর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা দরকার। তাঁরা জানতেন,

কীলারের সঙ্গে ব্রিটেনের সমর-মন্ত্রীর সম্পর্ক মোটেই নির্ভেজাল বন্ধুত্বের সম্পর্ক নয়। তাঁরা আরও জানতেন, যেমন প্রোফুমো, তেমনি আইভানভও কীলারের কাছে নিয়মিতভাবে যাতায়াত করেন। আইভানভ কি কীলারের মারফতে প্রোফুমোর কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় গুপ্ত-খবর সংগ্রহের চেষ্টা করছেন? প্রশ্নটা অকারণ নয়; এবং এই প্রশ্ন যদি জনাকয়েক সাংবাদিক আর এম. পি. কে একটু বেশী-পরিমাণে আলোড়িত করে থাকে, তবে নিশ্চয়ই তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না।

পার্লামেণ্টের সদস্যদের মধ্যে যাঁরা সেদিন জন প্রোফুমোর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, মিঃ উইগ তাঁদের অন্যতম।

২২শে মার্চ সকালে তাঁর বিবৃতি দিলেন জন প্রোফুমো। ২৬শে মার্চ বিকেলে মিঃ উইগের কাছে একটা জরুরী খবর এল। হাউস অব কমন্সের লবিতে বসে তিনি একজন সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলছিলেন; এমন সময় তিনি খবর পেলেন যে, ডঃ স্টীফেন ওয়ার্ড তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চান। মিঃ উইগকে তিনি ফোন করেছিলেন। পাননি। টেলিফোনেই তিনি জানিয়েছেন যে, মিঃ উইগ যেন দয়া করে তাঁকে একবার ফোন করেন। তাঁর ফোন নম্বর: প্যাডিংটন ৮৬২৫।

মিঃ উইগ চালাক মানুষ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ডঃ ওয়ার্ডের সঙ্গে যদি কথা বলতে হয়, তাহলে তার একজন সাক্ষী থাকা ভাল। কিন্তু এমনভাবে সাক্ষী রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ডঃ ওয়ার্ড কিছু টের না পান। টের পেলে তিনি হয়ত মুখই খুলতে চাইবেন না।

টেলিফোন-লাইনে অতএব বাড়তি একটি রিসিভার বসাবার ব্যবস্থা হল। বাড়তি রিসিভারে কান রাখলেন মিঃ উইগের সেই সাংবাদিক-বন্ধু। উইগ আর ওয়ার্ডের কথোপকথনের তিনি সাক্ষী রইলেন।

টেলিফোনে অবশ্য বিশেষ-কিছু কথাবার্তা হয়নি। কথাবার্তা হল খানিক বাদে, মিঃ উইগের অনুরোধে ডঃ ওয়ার্ড যখন পার্লামেণ্টে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন।

ডঃ ওয়ার্ড যদি না আসতেন, এবং নিজের থেকে যদি না তিনি প্রোফুমো, কীলার আর আইভানভের সম্পর্কে জরুরী কিছু তথ্য তুলে দিতেন মিঃ উইগের হাতে, তাহলে যে কী হত, বলা যায় না। ব্রিটেনের সমর-মন্ত্রী তাহলে হয়ত, অন্তত তখনকার মতন, রেহাই পেয়ে যেতেন, এবং ম্যাকমিলানকে তাহলে হয়ত শুনতে হত না যে, একজন মিথ্যাবাদীকে তিনি তাঁর মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়েছেন। রক্ষণশীল দলও হয়ত সঙ্কটের হাত থেকে রক্ষা পেত।

কিন্তু ওয়ার্ড যে-সব তথ্য সেদিন জানালেন, তার পরে আর প্রোফুমোর পক্ষে মিথ্যার আড়ালে আশ্রয় নেবার উপায় ছিল না; শুধুই শ্রমিক দল নয়, রক্ষণশীল দলেরও একটা মস্ত বড় অংশ সেদিন তাঁকে ধিক্কার দিয়েছিল। তাঁর মুখোশ তখন খসে পড়েছে; আত্ম-রক্ষার কোনও উপায় আর তখন তাঁর নেই।

মাত্রই কিছুকাল আগের কথা। কমন্স-সভায় দাঁড়িয়ে প্রোফুমো সেদিন বলেছিলেন, "মিস্ কীলারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বের। এই সম্পর্কের মধ্যে এমন কিছু ছিল না, যাকে অসঙ্গত বলা যেতে পারে।"

আর আজ জুনের প্রথমেই জন প্রোফুমোকে স্বীকার করতে হল, সে-কথা মিথ্যা কথা। অপরাধ স্বীকার করে ম্যাকমিলানের কাছে চিঠি লিখতে হল।

বড় করুণ, বড় কাতর সেই চিঠি।

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

আপনার মনে থাকতে পারে যে, পার্লামেণ্টে কয়েকটি অভিযোগ উত্থাপিত হবার পরে গত ২২ শে মার্চ তারিখে ব্যক্তিগত-ভাবে আমি একটি বিবৃতি দিয়েছিলাম।

আমার নামে গুজব ছড়ানো হচ্ছিল। বলা হচ্ছিল, আদালত থেকে যে একজন সাক্ষী উধাও হয়েছে, আমিই তার জন্য দায়ী।

বলা হচ্ছিল, এমন একটা ব্যাপারে আমি জড়িত আছি, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা যাতে বিপন্ন হওয়া সম্ভব।

দুটি অভিযোগই গুরুতর। নিরুদ্দেশ সাক্ষীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপারটার—এ সম্পর্কেও গুজব ছড়ানো হচ্ছিল—গুরুত্ব এই তুলনায় অনেক কম।

আমার বিবৃতিতে আমি বলেছিলাম যে, এই সম্পর্কের মধ্যে এমন কিছু ছিল না, যাকে অসঙ্গত বলা যেতে পারে। গভীর দুঃখের সঙ্গে আমি এখন স্বীকার করছি যে, কথাটা সত্যি নয়। আসলে আমি আপনাকে, আমার অন্যান্য সহকর্মীকে এবং কমন্স-সভাকে মিথ্যা কথা বলেছি।

আমার স্ত্রী আর পরিবারকে লজ্জার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যই আমি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলাম। যেমন তাঁদের, তেমনি আমার উপদেষ্টাদেরও আমি মিথ্যা বলেছি।

আমি বুঝতে পারছি যে, এই প্রবঞ্চনা এক গুরুতর অসদাচরণ, এবং প্রবঞ্চনা করে আমি সেই অসদাচরণের অপরাধে অপরাধী হয়েছি। আমার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অন্যান্য অভিযোগ যদিও ভিত্তিহীন, তবু এই অপরাধের পরে আর আপনার সরকারের মন্ত্রী কিংবা কমন্স-সভার সদস্যপদে অধিষ্ঠিত থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনাকে, মন্ত্রিসভায় আমার সহকর্মীদের, আমার নির্বাচকমণ্ডলীকে, এবং গত পঁচিশ বছর ধরে যে-পার্টির আমি সেবা করেছি সেই পার্টিকে আমি অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছি। তার জন্য যে কী নিদারুণভাবে আমি সন্তপ্ত, তা আপনাকে বোঝাতে পারব না।

আন্তরিকভাবে আপনার

জ্যাক প্রোফুমো

কুহকিনী কীলার! জন প্রোফুমো তার মোহিনী-মায়ায় ধরা দিয়েছিলেন। সেই দুর্বলতার মূল্য তাঁকে দিতে হয়েছে! তাঁর জন্য দুঃখ করে লাভ নেই। তার চাইতে বরং সেই সত্যান্বেষী মানুষ কজনকে ধন্যবাদ জানানো ভাল, মিথ্যাবাদী একজন মন্ত্রীর মুখোশ ছিঁড়ে দিতে যাঁদের দ্বিধা হয়নি।

কিন্তু সেই প্রশ্নটার প্রসঙ্গে এবারে ফিরে যাওয়া যাক, এই রচনার শুরুতে যার উল্লেখ করেছি। পরাস্ত, অপদস্থ রাজনীতিক কি আবার শুরুর থেকে তাঁর জীবন শুরু করতে পারেন?

বিলিতী খবর পড়ে জানা গেল, জন প্রোফুমো পেরেছেন। তাঁর কাজ এখন বস্তিবাসীদের সাহায্য করা। বস্তিতে গিয়ে দুয়ারে-দুয়ারে তিনি এখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন; খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কার সাহায্য পাওয়া দরকার। সাধ্যমতন তাদের সাহায্য করে বেড়াচ্ছেন তিনি।

তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে কি তিনি আবার নতুন করে গড়ে তুলতে চান? নাকি এ তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত? (১৫-৫-৬৪)

রাজ-কাহিনী

ইজিয়ান সমুদ্রের মধ্যে ছোট্ট দ্বীপ টেনোস। সেই দ্বীপ থেকে একটি জাহাজ সেদিন আথেন্সের দিকে ছুটে যাচ্ছিল। গ্রীক নৌবাহিনীর ডেস্ট্রয়ার; তার মধ্যে ছিল মাতা মেরির মূর্তি। ধর্মানুরাগী খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করেন, রত্নখচিত পবিত্র এই মূর্তির ছোঁয়া লাগলে যমের হাত থেকেও রোগীকে আবার ফিরিয়ে আনা যায়।

যমের হাত থেকে যাঁকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে সেদিন শেষ চেষ্টা করে দেখা হচ্ছিল, তিনি সাধারণ মানুষ নন, তিনি গ্রীসের রাজা পল। ডাক্তাররা তাঁকে তখনও জবাব দেননি বটে, কিন্তু বিশেষ আশাও তাঁরা আর দিতে পারছিলেন না। সুতরাং....

সুতরাং গ্রীক নৌবাহিনীর একটি ডেস্ট্রয়ারকে সেদিন টেনোসে পাঠানো হয়েছিল মাতা মেরির মূর্তিটিকে নিয়ে আসার জন্যে। ওষুধে কাজ হয়নি, এখন দৈব আশীর্বাদে যদি কিছু হয়।

তেইশ বছরের এক যুবক ওদিকে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলেন আথেন্স বন্দরে। জাহাজ এসে বন্দরে ভিড়বার সঙ্গে সঙ্গে ডেকের উপরে উঠে এসেছিলেন তিনি; মূর্তিটিকে হাতে নিয়ে আবার দ্রুত পায়ে বন্দরে নেমে গিয়েছিলেন। জেটির বাইরে অপেক্ষা করছিল তাঁর ঝকঝকে স্পোর্টস কার। দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে ঢুকে তিনি স্টীয়ারিং হুইল ধরেছিলেন।

শহর ছাড়িয়ে, পনর মাইল দূরে গ্রীসের রাজপ্রাসাদ। কিন্তু সেই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে যুবরাজ কন্‌স্টানটাইনের সেদিন বিশেষ সময় লাগেনি। তার কারণ, ঘণ্টায় এক শ মাইল স্পীডে তিনি সেদিন গাড়ি চালিয়েছিলেন।

প্রাসাদে ঢুকে বাবার রোগশয্যার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন

কন্স্টানটাইন। রানী ফ্রেডারিকা তাঁর স্বামীর পাশে বসে ছিলেন। চোখ দুটি রক্তবর্ণ। কেঁদে কেঁদে, এবং না-ঘুমিয়ে। পলের অবস্থা বেঁকে দাঁড়াবার পর থেকে তিনি দু-চোখের পাতা 'এক করতে পারেননি।

রাজা পল তাঁর বিছানার উপরে উঠে বসলেন। মাতা মেরির মূর্তিটিকে চুম্বন করলেন। বললেন, "আগের চাইতে আমি এখন অনেক সুস্থ বোধ করছি।"

তার মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাদেই তিনি মারা যান।

সাদায়-নীলে মেশানো গ্রীসের পতাকা। দেশের অসংখ্য গৃহচূড়ায় সেই পতাকা অর্ধনমিত হল। গির্জায়-গির্জায় বাজতে লাগল বিষণ্ণ ঘণ্টাধ্বনি। প্রতিটি ঘণ্টা উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে লাইকাবেটুস পাহাড়ের উপর তোপ গর্জে উঠতে লাগল। বুম-বুম-বুম। রাজা পল মারা গিয়েছেন। তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হচ্ছে।

গ্রীসের মানুষরা সেদিন বেদনা বোধ করেছিল। রাজাকে তারা ভালবাসত।

অথচ পল যে একদিন গ্রীসের রাজা হবেন, কেউ তা কখনও ভাবতে পারেনি। তিনি নিজেই কি পেরেছিলেন? ডেনমার্কের গ্লাক্সবার্গ রাজবংশের সন্তান তিনি; তাঁর ধমনীতে এক বিন্দু গ্রীক রক্ত নেই। গত শতকের মাঝামাঝি সময়ে গ্রীসের রাজ-সিংহাসন অবশ্য গ্লাক্সবার্গ-বংশের দখলে এসেছিল, কিন্তু তারপরে অনেক উত্থানপতন ঘটেছে। গ্রীসের রাজনীতি সিংহাসনের উপরে বিরূপ হয়েছে, বারবার আঘাত হেনেছে রাজতন্ত্রের উপরে। রাজাকে দিন কাটাতে হয়েছে গ্রীসের বাইরে, নির্বাসনে। পলেরও প্রথম জীবন বাইরেই কেটেছিল। ইংল্যাণ্ডে, ইংরেজ গবর্নেসের কাছে মানুষ হয়েছেন তিনি, ইংরেজী ইস্কুলে লেখাপড়া শিখেছেন। যুবাবয়সে, ছদ্মনামে ইংল্যাণ্ডের এক কারখানায় তিনি মাস কয়েকের জন্যে

চাকরিও করেছিলেন। অ্যাডভেঞ্চারে তাঁর আগ্রহ ছিল না, এমন কথাও বলা সম্ভব নয়। ছদ্মনামে যিনি ইংল্যাণ্ডের কারখানায় চাকরি করেছেন, ছদ্মবেশে গ্রীসে যেতেও তাঁর ভয় হয়নি। শোনা যায়, জনৈক বন্ধুর প্রমোদ-তরণীর মাল্লা সেজে তিনি একবার গ্রীসে ফিরেছিলেন। গালের উপরে ছিল কালো দাড়ির চাপ। গ্রীসের মানুষরা তাদের ছদ্মবেশী রাজপুত্রকে সেদিন চিনতে পারেনি।

গ্রীসের শাসন-ব্যবস্থা তখন প্রজাতান্ত্রিক। তার বছর কয়েক বাদে, এই শতকের চতুর্থ দশকে, যদিও নতুন করে একজন গ্লাকস্‌বার্গ-বংশীয়কে আবার গ্রীসের সিংহাসনে বসানো হয়েছিল, তবু পলই যে তাঁর পরে সিংহাসনে বসবেন, তা বোধহয় কারও ধারণায় ছিল না। তার কারণ, একে ত একালে রাজ-সিংহাসনের ভিত্তি অতি নড়বড়ে, তার উপরে আবার বংশের তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র নন। তিনি রাজভ্রাতা। সিংহাসনে বসেছিলেন তাঁর বড়ভাই, জর্জ। এ হল ১৯৩৬ সনের কথা। পলের বয়স তখন চৌত্রিশ। তার দু'বছর বাদে তিনি হানোভারের রাজকুমারী ফ্রেডারিকাকে বিবাহ করেন। উপাধিসহ তাঁর পুরো নামটা মস্ত বড়। হার হাইনেস ফ্রেডারিকা লুইসা প্রিন্সেস অব হানোভার, গ্রেট ব্রিটেন অ্যাণ্ড আয়ারল্যাণ্ড, ডাচেস অব ব্রন্‌সউইক। উপাধি থেকেই বোঝা যাবে যে, ইংল্যাণ্ডের রাজবংশের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার যোগ রয়েছে। জার্মানির অধীশ্বর কাইজার উইলহেল্‌ম দি সেকেণ্ডের পৌত্রী তিনি; ওদিকে ইংলণ্ডেশ্বরী মহারানী ভিক্টোরিয়া তাঁর বৃদ্ধপ্রপিতামহী। পলের সঙ্গে তাঁর বিবাহের সময়ে তাই রাজা ষষ্ঠ জর্জের অনুমতি লাভের প্রয়োজন হয়েছিল। বর-কনের মধ্যে বয়সের পার্থক্য নেহাত কম নয়, ষোল বছরের।

বিবাহের পরবর্তী বছরগুলি খুব সুখে কাটেনি। ১৯৩৮ সনে বিয়ে করলেন পল; ১৯৩৯ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল। সেই আগুনের আঁচ গ্রীসের গায়েও লেগেছে। ১৯৪১ সনে নাৎসীরা যখন গ্রীসের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, গ্রীকরা তাদের বাধা দিতে

পারেনি। পরে অবশ্য নাৎসীবিরোধী গুপ্তবাহিনী গড়ে উঠেছিল, দিনে-দিনে তীব্র হয়ে উঠেছিল প্রতিরোধ-সংগ্রাম। আজ যিনি সাইপ্রাসের নেতা, সেই মাকারিওস তখন গ্রীসে ছিলেন। গ্রীসের মুক্তি-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি। গুপ্ত-বাহিনীতে যোগ দিয়ে তিনি তখন নাৎসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছেন।

পল তখন ক্রাউন প্রিন্স। নাৎসীরা এসে গ্রীসে ঢুকবার পরে, স্ত্রী আর দুই শিশু সন্তানকে নিয়ে, তিনি পালিয়ে যান।

পালিয়ে তিনি প্রথমে গিয়েছিলেন ক্রীটে। ক্রীট থেকে কায়রো। কায়রো থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা। যুদ্ধের আগুন নিভবার পরে তিনি আবার সপরিবারে গ্রীসে ফিরে আসেন। তার কিছুদিন বাদেই তাঁর দাদা হঠাৎ মারা যান। দাদার মৃত্যুর পরে পল গিয়ে সিংহাসনে উঠলেন।

নাৎসীদের হাত থেকে গ্রীস তখন মুক্তি পেয়েছে বটে, কিন্তু শান্তির সম্ভাবনা তখনও সুদূরপরাহত। মূল্যমান গগনচুম্বী ; জনচিত্তে ব্যাপক হতাশা, ওদিকে দেশের উত্তরাঞ্চলে কমিউনিস্টদের দাপট তখন ক্রমেই বাড়ছে। সেই অবস্থায় রাজ্যময় ঘুরে বেড়িয়েছেন পল আর ফ্রেডারিকা, কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন। জিপে উঠে কখনও রণাঙ্গনে গিয়েছেন, কখনও রাত কাটিয়েছেন দরিদ্র কোনও চাষী-পরিবারের সঙ্গে। সেই পরিক্রমা শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়নি। আর কিছু না হক, গৃহযুদ্ধের আগুন শেষপর্যন্ত নিবেছিল।

রাজা হিসেবে পল কি খুব জনপ্রিয় হতে পেরেছিলেন? কিংবা রানী হিসেবে ফ্রেডারিকা? এ-প্রশ্নের উত্তর একইসঙ্গে 'হ্যাঁ' এবং 'না'। স্বদেশে তাঁরা অনেকের ভালবাসা পেয়েছেন, অনেকের পাননি। বিদেশের মধ্যে ইংল্যাণ্ডে তাঁরা স্পষ্টতই অসম্মানিত হয়েছিলেন। একটা কথা কিন্তু ঠিক। সেটা এই যে, পল নিতান্ত তাসের রাজা ছিলেন

না। শুধু সিংহাসনের শোভা বাড়িয়ে, অর্থাৎ ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করে আর রুপোর কাঁচি দিয়ে ফিতে কেটেই সন্তুষ্ট থাকেননি তিনি। এই গণতন্ত্রের যুগেও দেশের রাজনীতিকে তিনি যথাসম্ভব প্রভাবিত করতে চেয়েছিলেন। স্বদেশে অনেকে—বিশেষ করে শহরাঞ্চলের সম্পন্ন মানুষরা—সেটা সুনজরে দেখেনি। বিদেশে অনেকে বলে, গ্রীস জুড়ে যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছে, রাজা আর রানীই তার জন্য দায়ী। সমালোচনার ঝড় সম্ভবত ব্রিটেনেই সবচাইতে প্রবল হয়ে উঠেছিল।

ব্রিটিশ রাজ-পরিবারের এক বিয়ের নেমন্তন্ন রাখবার জন্যে গত বছরের প্রথম দিকে একবার ইংল্যাণ্ডে এসেছিলেন ফ্রেডারিকা। এসে লণ্ডনের রাজপথে কীভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তা হয়ত অনেকেরই মনে আছে। মার্কিন গায়িকা মার্টি স্টীভেন্স তখন তাঁর থী কিংস ইয়ার্ডের ফ্ল্যাটে বসে ছিলেন। হঠাৎ ধাক্কা পড়ল তাঁর দরজায়। বেরিয়ে এসে মার্টি দেখেন, ভয়বিহ্বল দুই বিদেশিনী তাঁর দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন।

"কে আপনারা? কী চান?"

"আমি গ্রীসের রানী ফ্রেডারিকা। আর এটি আমার মেয়ে। আমরা আশ্রয় চাই।"

উত্তর শুনে মার্টি অবশ্যই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু রানী ফ্রেডারিকা আর রাজকন্যা আইরিনের সেদিন আশ্রয় ভিক্ষা না করে উপায় ছিল না। পথের উপরে এক বিক্ষুব্ধ জনতা তাঁদের ঘিরে ধরেছিল। তাদের অনেকেই বামপন্থী প্রবাসী গ্রীক। মধ্যবয়সিনী এক ইংরেজ মহিলাও তাদের সঙ্গে ছিলেন।

তার মাস কয়েক বাদে গ্রীক রাজদম্পতি যখন আনুষ্ঠানিকভাবে আবার ব্রিটেন-সফরে এলেন, তখন বিক্ষোভ আরও উত্তাল হয়ে উঠেছিল, এবং বিক্ষুব্ধ জনতার ভিতরে আবারও দেখা গিয়েছিল সেই ইংরেজ মহিলাকে। তিনি কারারুদ্ধ গ্রীক কমিউনিস্ট নেতা আম্বাটিয়েলসের স্ত্রী, বেটি।

ভিক্টোরিয়া স্টেশন থেকে রানী এলিজাবেথ আর প্রিন্স ফিলিপ তখন গ্রীক রাজ-দম্পতিকে সঙ্গে নিয়ে বাকিংহাম প্রাসাদে ফিরছেন। হঠাৎ পেভ্‌মেণ্টের ভিড়ের ভিতর থেকে রাজপথের উপরে ছিটকে বেরিয়ে এলেন বেটি। রাজকীয় শকটের সামনে দাঁড়িয়ে ফ্রেডারিকার উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠলেন, "আমার স্বামীকে মুক্তি দাও।"

একা আম্বাটিয়েলস নন, রাজনৈতিক কারণে আরও অনেকে আজ গ্রীসের কারাগারে বন্দী-জীবন যাপন করছেন। ইংল্যাণ্ডে তাঁদের বন্ধুরা সেদিন ফ্রেডারিকাকে ধিক্কার দেবার জন্যে ট্রাফালগার স্কোয়ারে এক বিরাট বিক্ষোভ-সভার আয়োজন করেছিল। ধ্বনি দিয়েছিল, "নাৎসী রানী নিপাত যাক।"

নাৎসীদের সঙ্গে কি যোগ ছিল রানী ফ্রেডারিকার ? আদৌ ছিল না, এমন কথা বলা সম্ভব নয়। আর কিছু না হক, এককালে এই জার্মান রাজকন্যাটি 'হিটলার ইয়ুথ'-এর সদস্যা ছিলেন। আর তাই, শুধু প্রবাসী গ্রীকরা কেন, গ্রীক রাজ-দম্পতির ব্রিটেন-সফরে ইংরেজদেরও একটা মস্ত অংশ অখুশী হয়েছিল। পল আর ফ্রেডারিকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে ব্রিটিশ সরকারকে সেদিন তাই হিমসিম খেতে হয়েছে। অলডুইচের থিয়েটারে যে-রাত্রে তাঁদের "এ মিডসামার নাইট'স ড্রিম"-এর অভিনয় দেখাবার ব্যবস্থা হল, ব্রিটিশ সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তর সে-রাত্রে কোনও রকমের ঝুঁকি নিতে সাহসী হননি। সেদিনকার অভিনয়ের প্রতিটি টিকিট তাঁরা আগে থাকতেই কিনে রেখেছিলেন, এবং, বেছে বেছে, সেই টিকিট শুধু তাঁদের মধ্যেই বিতরণ করা হয়েছিল, গ্রীক রাজদম্পতির প্রতি যাঁরা বিরূপ নন। তবু ভয় কাটেনি। অজ্ঞাতনামা কে একজন নাকি ফোন করে জানিয়েছিল যে, থিয়েটারের মধ্যে বোমা মেরে গ্রীক রাজ-দম্পতিকে হত্যা করা হবে। অভিনয় শুরু হবার আগে অতএব মাইন ডিটেক্টর দিয়ে থিয়েটার-হলের প্রতিটি ইঞ্চি জমি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল। জনতার বিদ্রূপের হাত থেকে সেদিন রানী এলিজাবেথও রেহাই পাননি।

এখানে উল্লেখযোগ্য, রাজা-রানীর ব্রিটেন-সফরে গ্রীসের প্রধান-মন্ত্রা কারামানলিসের সায় ছিল না। রাজা পল তাঁর আপত্তিতে সেদিন কান দেননি। রানী ফ্রেডারিকাও না। বলেছিলেন, "যা হয় হক, আমরা যাব।" কারামানলিস অগত্যা পদত্যাগ করেছিলেন।

রাজা পল মারা গিয়েছেন। ফ্রেডারিকা আর এখন রানী নন। তিনি রাজমাতা। পুত্র কন্‌স্টানটাইন আজ গ্রীসের রাজা। তবে রানী হিসেবে ফ্রেডারিকার যে ক্ষমতা ছিল, এবং যে-ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে তাঁর কুণ্ঠা ছিল না, এখনই যে তা খর্ব হবে, এমন কথা খুব জোর দিয়ে বলবার উপায় নেই। প্রকাশ্যে কিছু বোঝা না যাক, আড়াল থেকে তিনি এখনও সুতো টানতে পারেন।

স্বামীর মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে পুত্রকে তিনি আশীর্বাদ করেছিলেন। বলেছিলেন, "পিতার আশীর্বাদ তোমার সহায় হোক।"

পিতার আশীর্বাদ থাকবে। মায়ের পরামর্শ থাকবে। আর থাকবে প্রধানমন্ত্রী পাপানড্রুর কূটবুদ্ধি। কিন্তু কনস্টানটাইনের শাসন তবু নির্বিঘ্ন না হতে পারে। তাঁর সমস্যা প্রধানত দুটি। এক, বামপন্থীদের বিরোধিতা। দুই, সাইপ্রাস।

বামপন্থীদের বিরোধিতা নিয়ে ব্রিটিশ সরকার খুব মাথা ঘামাবেন বলে মনে হয় না। তবে সাইপ্রাস নিয়ে নিশ্চয়ই ঘামাবেন। কেননা ১৯৪৮ সনেই সাইপ্রাস সম্পর্কে রাজা পল তাঁর দাবি জানিয়ে রেখেছেন, এবং সাইপ্রাসে আজ তাদের সংখ্যাই বেশী, গ্রীসের সঙ্গে যারা মিলন চায়। ফলে, তুর্কী সাইপ্রিয়টদের যাঁরা মুরুব্বী, সেই ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে গ্রীসের সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে ওঠা কিছু বিচিত্র নয়। তার লক্ষণ ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে।

কনস্টানটাইনকে অতএব ঘরে-বাইরে লড়তে হবে। তাঁর প্রধান সম্পদ তাঁর জনপ্রিয়তা, এবং সেই জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান হেতু এই যে, তিনি একজন পাকা অ্যাথলেট। তাঁর বয়স যখন উনিশ,

তখনই তিনি গ্রীসকে একটি গৌরবের উপহার এনে দিয়েছিলেন। অনেক বছর বাদে অলিম্পিকের প্রতিযোগিতায় গ্রীস সেবারে প্রথম একটি স্বর্ণপদক পেল। সেই স্বর্ণপদকটি জয় করেছিলেন কন্‌স্টানটাইন; গ্রীসের রাজপুত্র। আনন্দের আতিশয্যে রানী ফ্রেডারিকা সেদিন কেঁদে ফেলেছিলেন।

প্রশ্ন হচ্ছে, খেলায় যিনি পটু, রাজনীতির খেলায় তিনি এঁটে উঠতে পারবেন কিনা। আপাতত এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা, সদ্য তিনি সিংহাসনে বসেছেন। সুতরাং উত্তরের জন্যে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে।

রক্তাক্ত দ্বীপ

কিকো মঠের সন্ন্যাসী তাঁর শিষ্যকে ডেকে পাঠালেন। শিষ্য এল। সন্ন্যাসী বললেন, "সন্ন্যাস নিলে দাড়ি রাখতে হয়! এ-মঠের এই নিয়ম। তুমি কি ঘরে ফিরতে চাও?"

তরুণ শিষ্য ঘাড় নেড়ে জানাল, না।

"মঠেই থাকতে চাও তুমি?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে তোমাকে মঠের নিয়ম মেনে চলতে হবে। দাড়ি রাখতে হবে। রাজী?"

"না।"

শুনে ক্রুদ্ধ হলেন সন্নাসী। জোর করলেন। তাতে কোনও লাভ হল না। তরুণ শিষ্যের ধনুর্ভঙ্গ পণ, সে মঠে থাকবে, সন্ন্যাসী হবে, কিন্তু দাড়ি রাখবে না।

সন্ন্যাসী বেত দিয়ে এলেন। কিন্তু শিষ্য তবু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সন্ন্যাসী বেত চালাতে লাগলেন। আর, দাঁতে দাঁত চেপে, কান্না আটকে রেখে, তাঁর শিষ্য ক্রমাগত বলে যেতে লাগল, "না, না, না।"

এর পরে যে কী হবে, তরুণ শিষ্য তা খুব ভাল করেই জানত। সে জানত, মঠের নিয়ম লঙ্ঘন করবার শাস্তি বড় কঠোর। সে জানত, তাকে এই মঠ ছেড়ে চলে যেতে হবে। বারান্দা থেকে চত্বরে নামতে হবে। তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে যেতে হবে ফটকের দিকে। ফটক খুলে সে বাইরে গিয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু তখুনি সে চলে যাবে না। চুপচাপ সে দাঁড়িয়ে থাকবে। অন্তত ততক্ষণ, যতক্ষণ না আবার সন্ন্যাসী তার দিকে এগিয়ে যান।

সন্ন্যাসী যে এগিয়ে যাবেন, ছেলেটি তা জানত। সে জানত, অধ্যক্ষ তাকে ভালবাসেন। যতই অপরাধ করুক, তিনি তাকে বিদায় দিতে পারবেন না। বিদায় দিলেও ফিরিয়ে আনবেন।

ঠিক তাই হল। মঠের বারান্দা থেকে চত্বরে নেমে ধীর পায়ে সে ফটকের দিকে এগিয়ে গেল। ফটক খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। আর তখনই তার দিকে ছুটে এলেন সন্ন্যাসী। তার পিঠে হাত রেখে, সস্নেহ শান্ত গলায় বললেন, "ফিরে এস।"

অনেক দিন আগেকার ঘটনা। কিন্তু সাইপ্রাসের প্রেসিডেণ্ট আর্চবিশপ মাকারিওস সেই ঘটনার কথা আজও ভুলে যান নি। বলা বাহুল্য, তাঁর অধ্যক্ষের কথা তিনি মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর শ্মশ্রু-মণ্ডিত মুখের দিকে তাকালেই তা বুঝতে পারা যায়।

আসল কথাটা এই যে, দাড়ি রাখায় তাঁর আপত্তি ছিল না। কিন্তু হুকুম তামিল করায় ছিল। তিনি জেদী মানুষ। যতক্ষণ তিনি ভাল ব্যবহার পাচ্ছেন, ততক্ষণই তিনি ভাল। তারপরেই তাঁর অন্য মূর্তি। হুকুমের গলায় কথা বললেই তাঁর মেজাজ বিগড়ে যায়; জোর খাটাতে গেলে তাঁর জেদ আরও প্রবল হয়ে ওঠে। তখন আর তাঁকে দিয়ে কিছু করাবার উপায় নেই। চোখ রাঙিয়ে তখন আর কোনও লাভ হয় না।

রক্তাক্ত দ্বীপ সাইপ্রাসের মাটিতে দাঁড়িয়ে ইংরেজরা সেটা আজ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে।

ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ নেহাত আজকের নয়। কিন্তু সেই দীর্ঘ বিরোধের কথা বলবার আগে সংক্ষেপে তাঁর পরিচয় দেওয়া যাক।

মাকারিওস তাঁর বিশপ-জীবনের নাম। তার আগে পর্যন্ত তাঁর নাম ছিল মাইকেল। পদবী মুসকোস; ১৯১৩ সনে সাইপ্রাসের এক দরিদ্র চাষীর ঘরে তাঁর জন্ম। বাবা এখনও বেঁচে আছেন।

ছেলের সম্পর্কে অন্তত এইটুকু তাঁর আজও মনে আছে যে, ছাগল চরাবার কাজে সে মোটেই পটু ছিল না। এমন 'বোকা' ছেলেকে দিয়ে সংসারের কাজ ভালভাবে হবার কথা নয়। সুতরাং? সুতরাং তাঁকে মঠে পাঠিয়ে দেওয়া হল। মাইকেলের বয়স তখন মাত্র তের।

কিক্কো মঠের অধ্যক্ষ তাঁকে প্রথম দর্শনেই ভালবেসেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন, যে যাই বলুক, ছেলেটা মোটেই বোকা নয়। তবে হ্যাঁ, ভীষণ জেদী। ঠিকমত যদি একে মানুষ করে তোলা যায়, তবে…

তবে সেই জেদী ছেলে যে একদিন সাইপ্রাসকে স্বাধীন করবে এবং তার প্রথম প্রেসিডেন্ট হবে, কিক্কো মঠের অধ্যক্ষ হয়ত এতটাই আশা করেন নি। কিন্তু, তা না করুন, অন্তত এটুকু বিশ্বাস তাঁর নিশ্চয়ই ছিল যে, মাইকেল নেহাত সাধারণ ছেলে নয়। তা নইলে আর মঠের নিয়মকানুন বারবার লঙ্ঘন করা সত্ত্বেও মাইকেলকে তিনি ক্ষমা করবেন কেন?

মঠের ক্ষমা পেয়েছিলেন মাইকেল। ক্ষমার সঙ্গে সস্নেহ প্রশ্রয়। ১৯৪৬-এ তাঁকে বিশপের পদে বরণ করা হল। নতুন করে নাম রাখা হল মাকারিওস। কথাটার অর্থ "আশীর্বাদ-ধন্য"। তাঁর বয়স তখন তেত্রিশ। তার আগে তিনি আথেন্সে গিয়েছিলেন। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন আর ধর্মতত্ত্ব পড়তে পড়তেই যোগ দিয়েছিলেন নাৎসী-বিরোধী মুক্তিযুদ্ধে। বলা বাহুল্য, গ্রীস তখন নাৎসীদের কবলে। সন্ন্যাসীর জীবনে ক্ষমার আবেদন ছিল, কিন্তু ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা, সেখানে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর হতেও তাঁর কিছুমাত্র কুণ্ঠা ছিল না। বরং নিষ্ঠুর হওয়াই যে সেখানে পবিত্রতম কর্তব্য, তরুণ সন্ন্যাসী তা বুঝতে পেরেছিলেন। নাৎসীদের কবল থেকে গ্রীসকে উদ্ধার করবার জন্য মাইকেল তখন তাই গুপ্ত-সংগঠনে যোগ দিয়েছেন, সহিংস প্রতিরোধ গড়েছেন, এবং হিটলারের সৈন্যদের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন যুদ্ধ চালিয়েছেন।

যুদ্ধ শেষ হল। ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব চার্চেস-এর বৃত্তি নিয়ে

মাইকেল এলেন আমেরিকায়। সেখানে, বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে, তিনি ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনো করেছেন। তারপর ফিরে এসেছেন তাঁর আপন ভূমিতে, সাইপ্রাসে। পরবর্তী কাহিনী মাইকেলের নয়, মাকারিওসের। সে-কথা আগেই বলেছি।

কেমন মানুষ মাকারিওস? ভাল, না খারাপ? শান্তিবাদী, না যুদ্ধলিপ্সু? ঠাণ্ডা, না তপ্ত? এক কথায় এই বহুবিতর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। আসলে তাঁর সম্পর্কে যদি ভিন্ন-ভিন্ন লোককে প্রশ্ন করা হয়, তাহলে ভিন্ন-ভিন্ন রকমের জবাব পাওয়া যাবে। কেউ বলবে, তিনি ভীষণ ভাল। কেউ বলবে, ভীষণ খারাপ। বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ হ্যারল্ড ডিউল্‌ফ তাঁকে মনে রেখেছেন। তিনি বলেন, মাকারিওসের স্বভাব অনেকটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো নেতা মার্টিন লুথার কিংয়ের মতন। "দুজনেই বড় অমায়িক, বড় শান্ত স্বভাবের মানুষ।"

ইংরেজদের অনেকেই কিন্তু অন্য কথা বলে। একজন ইংরেজ অফিসারের ধারণা, "সহজে তিনি ধরা দিতে চান না, এবং কূটনৈতিক আর রাজনৈতিক প্যাঁচ কষতে তিনি দারুণ দক্ষ।" আর-একজনের মন্তব্য আরও কঠোর। তিনি বলেছেন, মাকারিওসের মতন "এতবড় নিপাট মিথ্যুক আমি দুটি দেখি নি।"

সাইপ্রাসের মানুষদের কাছেও মাকারিওসের সম্পর্কে ঠিক এই রকমেরই পরস্পরবিরোধী মতামত শোনা যাবে। সেখানকার গ্রীকরা বলবে, তিনি দেবদূত। বলবে, তিনি নিষ্পাপ সন্ত, খাঁটি দেশপ্রেমিক, মানবতাবাদী মহামানব। উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধায় তারা জানাবে যে, প্রেসিডেন্ট আর আর্চবিশপ হিসেবে যে-টাকা তিনি পান (অঙ্কটা লক্ষেরও উপরে), তার থেকে তিনি নিজের জন্যে এক পয়সাও নেন না, সবটাই যায় দানে। অথচ, সাইপ্রাসের তুর্কীরা বলবে যে, তিনি একটি পাকা শয়তান, এবং তাঁর মতন এতবড় ধোঁকাবাজ লোক আর দ্বিতীয়টি কোথাও জন্মায়নি।

কিন্তু, তাঁর চরিত্র সম্পর্কে যে যাই বলুক, একটা কথা সম্ভবত সকলকেই স্বীকার করতে হবে। সেটা এই যে, সাইপ্রাস যদি না মাকারিওসের নেতৃত্ব পেত, তাহলে ইংরেজদের এত সহজে সেখান থেকে হটানো যেত না।

ছোট্ট দ্বীপ সাইপ্রাস। উত্তরে, মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে, তুরস্ক; উত্তর-পশ্চিমে গ্রীস। টলটলে নীল ভূমধ্যসাগরের জলের উপরে সাইপ্রাসকে প্রায় একটা ভাসমান খড়েগর মতন দেখায়। সেই খড়েগর উপরে এখন গৃহযুদ্ধের রক্ত লেগেছে। কেন লেগেছে, সেটা বুঝতে হলে অতীত-ইতিহাসের কয়েকটা পৃষ্ঠাকে এখানে উলটে যাওয়া দরকার।

সাইপ্রাস আগে ছিল তুরস্কের দখলে। ১৮৭৮ সনে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন ডিসরেলি আর অটোমান সুলতানের মধ্যে এক চুক্তি হয়; সেই চুক্তিবলে সাইপ্রাস আসে ইংরেজদের হাতে। তার প্রায় চল্লিশ বছর পরের কথা। প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক যোগ দিল জার্মানির সঙ্গে, আর সেই সহযোগিতার শাস্তি হিসেবে সাইপ্রাসকে একেবারে পাকাপাকিভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হল।

ছোট্ট দ্বীপ। লোকসংখ্যা বেশী নয়। মাত্র ছ লাখ। তার মধ্যে পাঁচ লাখ গ্রীক; এক লাখ তুর্কী। ইংরেজরা সম্ভবত ভেবেছিল যে, এই ছ লাখ মানুষকে দাবিয়ে রাখা খুব কঠিন হবে না। কখনও মিষ্টি-কথায় ভুলিয়ে-ভালিয়ে, কখনও-বা চাবুক চালিয়ে, তাদের আনুগত্য আদায় করা যাবে। সেই সঙ্গে, বিদেশে নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্যে সর্বত্র তারা যার শরণ নিয়েছে, কুখ্যাত সেই 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' নীতির ধারালো অস্ত্রখানা ত ছিলই। সুতরাং ইংরেজরা যদি ভেবে থাকে যে, সাইপ্রিয়টদের ভিতর থেকেই কিছু লোককে নিজের দলে টেনে নিয়ে তারা জমিদারির কাজটা চমৎকার চালাবে,

এবং এই কথা ভেবে তারা যদি কিছুটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করে থাকে, তবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

তাদের ভুল ভাঙতে দেরি হয়নি। পরাধীনতার শিকল ভাঙার জন্যে সাইপ্রাসে, খুব অল্প দিনের মধ্যেই, মুক্তি-সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে মাকারিওস সেই সংগ্রামের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন।

একটা কথা এখানে বলা দরকার। সেটা এই যে, প্রকাশ্যে এবং নেপথ্যে, মুক্তির জন্য সংগ্রাম প্রধানত গ্রীক সাইপ্রিয়টরাই চালিয়েছে। প্রকাশ্য সংগ্রামের নেতা ছিলেন মাকারিওস। আর গুপ্ত-আন্দোলন চালাত ইয়োকা-বাহিনী, যার নেতৃত্ব ছিল কর্নেল গ্রিভাসের হাতে। বিপ্লবী গ্রীক নেতা গ্রিভাসের দাপটে সারা সাইপ্রাস জুড়ে অচিরে এক ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হল। ব্যাপক ভাবে চোরাগোপ্তা আক্রমণ চলতে লাগল ব্রিটিশ সৈন্যদের উপরে। অনেকে সন্দেহ করলেন, মাকারিওসের সঙ্গে গ্রিভাসের একটা যোগ থাকা কিছু বিচিত্র নয়।

এ হল ১৯৫৫ সনের কথা। সন্ত্রাসবাদী ইয়োকা-বাহিনীর আক্রমণের ফলে সাইপ্রাসে তখন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। পরের বছর নির্বাসিত করা হল মাকারিওসকে। প্লেনে উঠবার আগে পর্যন্ত মাকারিওস জানতেন না, কোথায় তাঁকে নির্বাসন দেওয়া হবে। ইংরেজের বিমান সাইপ্রাসের মাটি থেকে আকাশে উঠবার পরে তাঁকে সেটা জানান হল। বলা হল, তাঁকে সিসিল্‌স দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শুনে নাকি হেসেছিলেন মাকারিওস। শান্ত গলায় বলেছিলেন, "চমৎকার। শুনেছি, সিসিল্‌স অতি সুন্দর দ্বীপ। সেখানে আমি নিশ্চিন্ত চিত্তে বিশ্রাম নিতে পারব।"

কিন্তু ব্রিটিশ সরকার যাই ভেবে থাকুন, সন্ন্যাসী নেতাকে দেশছাড়া করেও সাইপ্রাসকে তাঁরা বাগে আনতে পারেননি। বরং মাকারিওসকে নির্বাসন দেবার পরে ইয়োকার দাপট আরও দুঃসহ হয়ে উঠল। মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত ঘরছাড়া একদল তরুণ, দাসত্বের যন্ত্রণা তাদের

বুকের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, সন্ত্রাসবাদী নেতার নির্দেশে বন্দুক আর বোমা নিয়ে সাইপ্রাসের সর্বত্র তারা অশরীরী ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায়। ব্রিটিশ সৈন্য চোখে পড়লেই তারা আড়াল থেকে নিশানা ঠিক করে, তারপরে ট্রিগার টেনেই মুহূর্তে আবার ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে যায়। লোকজন ছুটে আসে। এসে দেখতে পায়, আরও একটি ইংরেজ হঠাৎ রক্তাপ্লুত শরীরে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়েছে।

শুধু সৈন্য নয়, তাদের পরিবারের লোকজনরাও তখন ইয়োকার বন্দুকের লক্ষ্য হয়েছে। শুধু ইংরেজ নয়, সাইপ্রিয়টদের মধ্যে যারা ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, তাদেরও নাম উঠেছে ইয়োকার 'কালো তালিকা'য়। গুপ্তঘাঁটির থেকে নির্দেশ এসেছে, মাতৃভূমির যারা শত্রু, তাদের কাউকেই ক্ষমা কোরো না।

কারা হাত মিলিয়েছিল বিদেশী শাসকের সঙ্গে? হাত মিলিয়েছিল প্রধানত সাইপ্রিয়ট তুর্কীরা। বিদেশী শাসকের পুলিস-বাহিনীতে নাম লিখিয়ে তারা স্বদেশের মুক্তি-আন্দোলনে বাধা দিয়েছিল। তারা বুঝতে পারেনি যে, সাইপ্রাস থেকে ইংরেজদের একদিন তল্পি গোটাতে হবে। সেই তল্পি গোটাবার দিন যখন আসন্ন, তখন ভয় পেয়ে গেল তুর্কীরা। এতদিন বাদে তারা বুঝতে পারল যে, বিদেশী শাসকের ছত্রচ্ছায়াটা অপসৃত হবার পরে হয়ত তারা গ্রীক সাইপ্রিয়টদের ক্ষমা পাবে না।

কিন্তু সকলেই জানেন যে, ইংরেজ শাসকরা তাদের বশংবদ শ্রেণীকে সর্বদাই মনে রাখে। মুসলিম লীগকে তারা মনে রেখেছিল; সাইপ্রাসের তুর্কী-সহযোগীদেরও তারা ভুলে যায়নি। এককালে তাদের নীতি ছিল, ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল। এখন তাদের নীতি হচ্ছে ডিভাইড অ্যাণ্ড লীভ। ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নেবার আগে দেশটাকে তারা দু টুকরো করে রেখে গিয়েছে। সাইপ্রাসকেও হয়ত দু টুকরো করা হত। তা যখন করা গেল না, তখন এমন ব্যবস্থা করা হল,

সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীন সাইপ্রাসের শাসন-ব্যবস্থায় তুর্কীদের প্রাধান্য যাতে অটুট থাকে।

সাইপ্রাসকে স্বাধীনতা না-দিয়ে উপায় ছিল না। সেখানকার মুক্তি-যোদ্ধাদের আক্রমণে ব্রিটিশ সৈন্যরা যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, তখন—যেমন বিদেশে তেমনি স্বদেশেও—দাবি উঠেছিল যে, আর নয়, ইংরেজরা এবারে সাইপ্রাস থেকে সরে আসুক। বিদায়ের প্রস্তুতি হিসেবে মাকারিওসকে তাঁর নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে আনা হল। বৈঠকের পর বৈঠক বসতে লাগল ; এবং শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হল যে, সাইপ্রাস স্বাধীনতা পাবে। কিন্তু—

কিন্তু বড় বিচিত্র সেই স্বাধীনতা। তার শর্ত হিসেবে অদ্ভুত এক সংবিধান মেনে নিতে হয়েছে সাইপ্রিয়টদের। তাতে বলা হয়েছে, পররাষ্ট্র-নীতি, কর-নির্ধারণ আর প্রতিরক্ষার ব্যাপারে যেমন প্রেসিডেন্ট তেমনি ভাইস-প্রেসিডেন্টের হাতেও 'ভেটো' থাকবে। সাইপ্রাসের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডঃ ফাজিল কুচুক একজন তুর্কী সাইপ্রিয়ট। তাহলেই দেখা যাচ্ছে, পূর্বোক্ত তিনটি ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও কোনও সিদ্ধান্ত যদি তুর্কীদের পছন্দ না হয়, তাহলে সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও, ভাইস প্রেসিডেন্টের 'ভেটো'র ক্ষমতার জোরে, সেই সিদ্ধান্ত তারা নাকচ করে দিতে পারবে। শুধু তাই নয়, সাইপ্রাসে যাদের জনসংখ্যার অনুপাত শতকরা কুড়ি, সেই তুর্কীরা সেখানে সেনাবাহিনীতে শতকরা চল্লিশটি, অসামরিক সরকারী দপ্তরে শতকরা তিরিশটি, এবং পুলিস-বাহিনীতেও শতকরা তিরিশটি চাকরি পাবে।

কিন্তু যে-চুক্তি অনুযায়ী সাইপ্রাসকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তার সবচাইতে বিস্ময়কর শর্ত এই যে, সাইপ্রাসের স্থিতাবস্থার ব্যত্যয় ঘটতে পারে, এমন আশঙ্কা যদি দেখা দেয়, তাহলে ব্রিটেন গ্রাস আর তুরস্ক তার বিরুদ্ধে 'ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবে।'

বলা বাহুল্য, আত্মসম্মানসম্পন্ন কোনও মানব-গোষ্ঠীর পক্ষে এমন

শর্তকণ্টকিত স্বাধীনতা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। মেনে নিতে পারেনি সাইপ্রাসের গ্রীকরাও। স্বাধীন হবার পরে এখন তারা দেখতে পাচ্ছে যে, এই শর্তগুলি তাদের সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী। মাকারিওস অতএব রাষ্ট্রপুঞ্জের শরণ নিয়েছেন। অন্য কোনও দেশ যাতে না সাইপ্রাসের ভিতরে নাক গলাতে পারে, তার জন্য দাবি জানিয়েছেন। সাইপ্রাসের সংবিধান তিনি আবার নতুন করে রচনা করতে চান।

করবার দরকার নেই, এমন কথা মোটেই বলা যায় না। সত্যি বলতে কী, শুধু গ্রীকদের নয়, তুর্কীদের স্বার্থেও এ-কাজ করা দরকার। কেননা, তুর্কীদের প্রতি অতিরিক্ত অনুগ্রহ দেখিয়ে যাঁরা এই পক্ষপাতী সংবিধানের ব্যবস্থা করেছিলেন, গ্রীক আর তুর্কী সাইপ্রিয়টদের বিরোধ তাঁরা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন মাত্র। শেষ বিচারে দেখা যাবে যে, তুর্কীদের পক্ষে তার ফল বিশেষ ভাল হবার কথা নয়।

ফল ইতিমধ্যেই খারাপ হয়েছে। গৃহযুদ্ধের আগুন আরও লেলিহান হয়ে জ্বলে উঠেছে সাইপ্রাসে। তুর্কী-সাইপ্রিয়টদের দেখলে বন্দুকের নিশানা ঠিক করে নিতে গ্রীক-সাইপ্রিয়টদের হাত কাঁপে না; গ্রীক-সাইপ্রিয়টদের দেখলেই তুর্কী-সাইপ্রিয়টরা তাদের ছুরি শানিয়ে নেয়। এক পাড়ায় মানুষ হয়েছে, এক ইস্কুলে পড়েছে, এমন দুই বন্ধুর মুখও আজ—পরস্পরের কথা বলতে গিয়ে—ঘৃণায় বেঁকে যায়। কারণ, তাদের একজন গ্রীক, অন্যজন তুর্কী।

বিদেশী এক পত্রিকার প্রতিনিধি সম্প্রতি সাইপ্রাসের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে আশঙ্কা হয়, এই ঘৃণার নিবৃত্তি সহজে হবে না। সাইপ্রাসের গ্রীক-গ্রাম জিরোজে গিয়ে সেখানকার ডাক্তারের সঙ্গে তিনি দেখা করেছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুর্কী গ্রাম লেফকার ডাক্তার সেলচুক সোমেককে তিনি চেনেন কিনা। উত্তরে গ্রীক ডাক্তার ডায়োমিডিস ইজাইয়াস বলেছিলেন, "তা আর চিনি না, খুব চিনি। ছেলেবেলায় আমরা এক সঙ্গে খেলতুম। হোক তুর্কী,

সোমেককে ঘৃণা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা ঘৃণা না করলে কী হবে, তুর্কীরা আমাদের ঘৃণা করে। তারা আমাদের খুন করতে চায়।”

লেফকা গ্রামের তুর্কী ডাক্তার সোমেকও এই একই উত্তর দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, “ইজাইয়াস আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। অতি চমৎকার ডাক্তার। কিন্তু····কিন্তু গ্রীব রা আমাদের ঘৃণা করে।”

জিরোজ গ্রামের জর্জ লোয়াজু উদার মনের মানুষ। সাংবাদিককে তিনি বলেছিলেন, “আপনি ত লেফকায় যাচ্ছেন? খুব ভাল হল। সেখানে মুনির হোসেনের সঙ্গে যদি আপনার দেখা হয় ত এই সিগারেটের প্যাকেটটা তাকে দেবেন। আমার নাম করে বলবেন যে, তাকে উপহার পাঠিয়েছি।”

উপহার নেননি মুনির হোসেন। কেননা তিনি তুর্কী, এবং জর্জ লোয়াজু গ্রীক। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তিনি বলেছিলেন, “লোয়াজুকে বলবেন যে, হাত যাদের রক্তাক্ত, সেই গ্রীকদের কাছ থেকে কোনও উপহার নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।”

ঘৃণা, ঘৃণা, ঘৃণা। সাইপ্রাস জুড়ে আজ ঘৃণার আগুন জ্বলছে।

বলা বাহুল্য, এই অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি একদিনে হয়নি। তিলে-তিলে রাগ জমেছে: দিনে-দিনে বড় হয়েছে বিরোধের বিষবৃক্ষ। এবং তার ফলে যে ব্যাপক বিদ্বেষ দেখা দিয়েছে, সেই বিদ্বেষের আবহাওয়ার মধ্যে একমাত্র বন্দুকের ভাষাই শ্রুতিগোচর হওয়া সম্ভব।

বন্দুকের ভাষায় যারা কথা বলতে চায়, সাইপ্রাসে আজ তাদের সংখ্যাই বেশী। তাদের একদল তাকিয়ে আছে তুরস্ক আর ব্রিটেনের দিকে। অন্য দলের লক্ষ্য গ্রীস। তাদের মুরুব্বী হিসেবে তুরস্ক আর গ্রীসের সম্পর্কও তিক্ত থেকে তিক্ততর হচ্ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, তুর্কী-সাইপ্রিয়টদের সাহায্য করবার জন্যে তুরস্ক হয়ত সাইপ্রাসের

উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যদি পড়ে তবে গ্রীসই কি নেহাত শান্ত বালকের মতন হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? গ্রীসের সঙ্গে যারা মিলন চায়, এমন মানুষের সংখ্যাও তো সাইপ্রাসে কম নয়। গ্রীক সমাজে ব্যাপক বিদ্রূপের লক্ষ্য হয়েছে ব্রিটেন আর যুক্তরাষ্ট্রের তুর্কী-প্রীতি। ন্যাটোর পক্ষে যে এই অবস্থাটা খুবই অস্বস্তিজনক, তাতে সন্দেহ নেই। তার কারণ তুরস্ক আর গ্রীস, দুটি দেশই ন্যাটো অর্থাৎ উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার সদস্য।

দেশের মধ্যে অশান্তি। সেই অশান্তির আগুনকে জ্বালিয়ে রাখবার প্ররোচনা আসছে বাইরে থেকেও। তুরস্ক ওদিকে বারবার দাবি করছে, সাইপ্রাসকে দ্বিখণ্ড করতে হবে। সন্ন্যাসী মাকারিওস অগত্যা রাষ্ট্রপুঞ্জের শরণ নিয়েছেন। তিনি চান না, সাইপ্রাস আজ বৃহৎ প্রতিবেশীদের মল্লভূমিতে পরিণত হোক। ব্রিটেন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য মাকারিওসের উদ্যোগকে মোটেই সুনজরে দেখেনি। তারা বলেছিল, রাষ্ট্রপুঞ্জের শরণ নিলে আশু সমাধানের সম্ভাবনা নেই; তার চাইতে বরং ন্যাটো কিংবা কমনওয়েলথভুক্ত দেশ থেকে দশ হাজার সৈন্য পাঠানো হোক। সাইপ্রাসের রাজনৈতিক সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান না-হওয়া পর্যন্ত এই সৈন্যরা সেখানে শান্তিরক্ষা করবে। উত্তরে মাকারিওস বলেছিলেন, না। সাইপ্রাসে এখন সাত হাজার ব্রিটিশ সৈন্য রয়েছে। মাকারিওস বলেছেন, সংখ্যাটাকে আর বাড়ানো চলবে না। শক্ত মানুষ মাকারিওস। ন্যাটোর নেতারা চাপ দিলেই যে তিনি নতিস্বীকার করবেন, এমন কথা ভাবা কঠিন।

তাঁর চরিত্র-সংহারের জন্যে অবশ্য চেষ্টা চলছে। বলা হচ্ছে যে, তিনি সাইপ্রাসের আকেল অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টিকে চটাতে চান না। কিন্তু সত্যিই কি তাই? কে না জানে, কমিউনিস্ট চীন যেদিন ভারতবর্ষের উপর ব্যাপকভাবে হানা দেয়, ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে মাকারিওস সেদিন ভারতবর্ষকেই তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন।

সেই শক্ত মানুষটির আপন ভূমিতে আজ গৃহযুদ্ধের রক্ত ঝরছে।

অচিরে কি এই রক্তক্ষয় বন্ধ হবে না? বন্ধ হলেই সেই শান্তি কি স্থায়ী হবে? শান্তিস্থাপনের জন্যে রাষ্ট্রপুঞ্জের স্বস্তি-পরিষদ একবাক্যে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন যে, তিন মাসের জন্য সাইপ্রাসে একটি শান্তি-বাহিনী পাঠানো হবে। তাতে সৈন্য দেবার জন্য উ থাণ্ট ইতিমধ্যেই কয়েকটি রাষ্ট্রকে অনুরোধ জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের এই বাহিনীর দায়িত্ব থাকবে একজন ভারতীয় সেনানায়কের উপরে। তিনি লেঃ জেনারেল প্রেম সিং জ্ঞানী।

উদ্যোগটা শুভ, এবং এক হিসেবে এতে মাকারিওসের দাবিই জয়যুক্ত হয়েছে। তবে সাইপ্রাসে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের দায়িত্ব যে অনেকাংশে তুর্কী-সাইপ্রিয়টদের উপরেই নির্ভর করছে, তাতে সন্দেহ নেই। দেশের মুক্তি-সংগ্রামে তারা গ্রীকদের সঙ্গে সহযোগিতা করেনি। গ্রীকরা সে-কথা ভুলতে পারে, যদি তুর্কীরা আজও পক্ষপাতী সংবিধানকে টিকিয়ে রাখবার দাবি না জানায়। প্রাপ্যের অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধার জন্য লালায়িত না হয়ে, এবং তুরস্ক আর ব্রিটেনের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তারা যদি গ্রীকদের সঙ্গে সরাসরি মীমাংসা করতে চায়। নিজেদের আচরণের মাধ্যমে যদি তারা প্রমাণ করতে পারে যে, আগে তারা সাইপ্রিয়ট, তারপর তুর্কী।

আবার ক্যু

রাত তখন একটা। সেই নিশুতি রাত্রে, অন্ধকারের মধ্যে গুঁড়ি মেরে, নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছিল একদল সৈন্য। দক্ষিণ ভিয়েতনামের সৈন্য। কথা ছিল, বেন ক্যাটের কাছে ভিয়েত কং গেরিলাদের গুপ্ত ঘাঁটির উপরে তারা অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। জায়গাটা সায়গনের উত্তর দিকে, মাইল পঁচিশেক দূরে। কিন্তু উত্তরে এগোতে এগোতে পঞ্চম ডিভিশনের সৈন্যরা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। বেন ক্যাটের দিকে নয়, বিয়েন হোয়া রাজপথের উপর দিয়ে রাজধানী সায়গনের দিকে এগোতে লাগল তারা। তাদের গতি এবারে আগের চাইতে দ্রুত।

উত্তরে বেন ক্যাট। দক্ষিণে মাই থো। বেন ক্যাটের দিক থেকে দক্ষিণে মুখ ফিরিয়ে পঞ্চম ডিভিশনের সৈন্যরা যখন সায়গনের দিকে এগিয়ে আসছে, ঠিক সেই সময়ে মাই থো-র দিক থেকেও আর-একদল সৈন্য হঠাৎ উত্তর দিকে যাত্রা শুরু করেছিল। তারা সপ্তম ডিভিশনের সৈন্য। এবং তাদেরও লক্ষ্য সায়গন।

সায়গন যে হঠাৎ দু দিক থেকে আক্রান্ত হবে, দক্ষিণ ভিয়েতনামের নতুন নায়ক জেনারেল ডুয়ং ভ্যান মিন অর্থাৎ বিগ মিন তা বুঝতে পারেননি। তাঁর জঙ্গী শাসনপরিষদের অন্যান্য জেনারেলরাও তখন নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিচ্ছিলেন। দরজায় ধাক্কা পড়তে তাঁদের ঘুম ভাঙল। এবং, এত রাতে এইভাবে ঘুম ভাঙাবার অর্থ কী, সেটা ভাল করে বুঝে উঠবার আগেই তাঁরা দেখতে পেলেন যে, তাঁদেরই সৈন্যদলের হাতে তাঁরা বন্দী হয়েছেন।

বিগ মিনের বিদ্রোহ আর নগুয়েন খানের বিদ্রোহ—মাঝখানে মাত্র মাস তিনেকের ব্যবধান। প্রথম বিদ্রোহে দিয়েমের পতন হয়েছিল; দ্বিতীয় বিদ্রোহে পতন হল মিন-চক্রের। তফাত এই যে, তিন মাস

আগের সেই বিদ্রোহে বিস্তর গুলি ছুটেছিল, এবং—রক্তের বন্যা বয়ে না-গেলেও—দিয়েম-পরিবারের দুই প্রধান ভাইকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। সেক্ষেত্রে, জেনারেল খানের এই নিঃশব্দ বিদ্রোহে নাকি একটির বেশী গুলী ছোটেনি।

সায়গন তখনও ঘুমিয়ে ছিল। ঘুম থেকে উঠে শহরবাসীরা শুনতে পেল যে, জমানা পালটে গিয়েছে। তাদের ভাগ্যবিধাতা এখন বিগ মিন নন, নগুয়েন খান।

গোল মুখ, কঠিন চাউনি, থুতনির নীচে ছুঁচলো দাড়ি, মেজর জেনারেল নগুয়েন খানের বয়স বেশী নয়। মাত্র ছত্রিশ। দিয়েমকে হটাবার ব্যাপারে বিগ মিনকে তিনি সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু মিন-গোষ্ঠী যে সে-কথা মনে রেখেছিলেন, এমন মনে হয় না। আসলে হয়ত খানকে তাঁরা কখনও খুব বিশ্বাস করেন নি। তাই, ক্ষমতা পাবার পরে, কড়া ধাতের এই মানুষটিকে তাঁরা ধারেকাছে না-রেখে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দূরে মানে রণক্ষেত্রে; তাও কমিউনিস্ট উত্তর ভিয়েৎনামের কাছাকাছি এলাকায়। এখন দেখা যাচ্ছে, দূরে থেকেও সেই অবহেলার কথা ভুলতে পারেন নি খান। ভিয়েতনামের দক্ষতম ফীল্ড অফিসার হিসেবে যাঁর খ্যাতি, গেরিলাদের সঙ্গে যুদ্ধের অবসরে নিজের সৈন্য আর সহকর্মীদের মধ্যে মিন-বিরোধী বিদ্রোহের বীজ বুনতেও তাঁর অসুবিধে হয়নি, এবং প্রথম সুযোগেই তিনি আবার রাজধানীতে ফিরে এসেছেন।

মিন-গোষ্ঠীর পতন ঘটাবার খানিক বাদেই নাকি হেনরি ক্যাবট লজকে তিনি ফোন করেছিলেন। জানিয়েছিলেন, মার্কিন রাষ্ট্রদূত যদি তাঁর সঙ্গে এসে দেখা করেন ত বড় ভাল হয়। লজ এসেছিলেন। এসে দেখেছিলেন, নিশাজাগরণে-ক্লান্ত নায়ক ব্রেকফাস্ট খাচ্ছেন। সেই অবস্থাতেই তাঁদের কথাবার্তা হল। খান জানালেন, মিন-গোষ্ঠীকে না-হটিয়ে তাঁর উপায় ছিল না। দেশকে তাঁরা ‘নিরপেক্ষতা’র দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। অর্থাৎ এমন ‘নিরপেক্ষতা’র

দিকে আসলে যা কমিউনিস্ট-ঘেঁষা, এবং ভিয়েত কং গেরিলারাই যার ফলে লাভবান হত।

দায়িত্বটা আসলে কার? খানের মতে তিনজনের। সেই তিনজন হচ্ছেন মেজর জেনারেল ত্রান ভান দন, মেজর জেনারেল লে ভান কিম আর মেজর জেনারেল মাই হু জুয়ান। প্রথমজন দক্ষিণ ভিয়েতনামের সৈন্যবাহিনীর কমাণ্ডার ইন চীফ। দ্বিতীয়জন চীফ অব জেনারেল স্টাফ। তৃতীয়জন পুলিস বাহিনীর বড়কর্তা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আওতা থেকে সরিয়ে এনে দক্ষিণ ভিয়েতনামকে তাঁরা নাকি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাইছিলেন, এবং তার জন্যে তাঁরা নাকি ফরাসী এজেন্টদের সঙ্গে 'চক্রান্তে' লিপ্ত হতেও কুণ্ঠিত হননি।

ব্যাপারটায় তাহলে দ্য গলেরও হাত ছিল? থাকলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আসলে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ফ্রান্স তার সাম্রাজ্য খুইয়েছে বটে, কিন্তু সেখানে সে আজ নতুন পথে তার প্রভাব বিস্তার করতে চায়। নতুন পথে মানে কূটনীতির খিড়কি-পথে। ফ্রান্স ঠিক তা-ই করছে। তার কূটনীতিতে সে আবার নতুন করে শান দিচ্ছে।

দ্য গল অবশ্য তাঁর মনের কথা গোপন করেননি। কিছুদিন আগেও এক সাংবাদিক-সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে নিরপেক্ষ অঞ্চলে পরিণত করা দরকার। প্রেসিডেন্ট জনসনের তাতে, বলাই বাহুল্য, আপত্তি আছে। সেই আপত্তির কথাটাকেই তিনি একটু ঘুরিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। নিরপেক্ষতার প্রস্তাবকে সরাসরি খারিজ করে না-দিয়ে তিনি বলেছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রস্তাবটিকে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখবে, যদি....

যদি "দক্ষিণ ভিয়েতনামের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভিয়েতনামকেও নিরপেক্ষ করবার" ব্যবস্থা করা হয়। অনেকে বলেন, চীনের প্রভুত্ব

উত্তর ভিয়েতনামের পক্ষে ইতিমধ্যেই দুঃসহ হয়ে উঠেছে। কিন্তু উত্তর ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট রাষ্ট্রনায়ক তাই বলে সত্যিই নিরপেক্ষ হতে চাইবেন কি? সেটা পরের কথা। আপাতত অন্তত এইটুকু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, শুধু দক্ষিণ ভিয়েতনামকে নিরপেক্ষ করবার ব্যবস্থা করলে কমিউনিস্টরা যে বাড়তি সুবিধাটুকু পেয়ে যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা দিতে রাজী নয়।

রাজী না হওয়াই স্বাভাবিক। এবং নগুয়েন খান যেহেতু নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে, সুতরাং তাঁর প্রতি একটু বেশী রকমের প্রসন্ন হওয়াও যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, খানের পূর্বসূরী কি সত্যই ফরাসী প্রস্তাবের দিকে ঝুঁকেছিলেন? অনেকেই বলবেন, না। এবং নিজের অভিমতের সপক্ষে তাঁরা জানাবেন যে, মিনের সময়ে সায়গনের রাস্তায় যখন দ্য গল-বিরোধী মিছিল বেরিয়েছিল, বিক্ষোভকারীদের তখন বাধা দেওয়া হয়নি। আর তা ছাড়া, জনচিত্তে মিনের প্রভাব নেহাত সামান্য নয়। কে জানে, মিন-চক্রের পতন ঘটাবার পরে খান হয়ত সেইজন্যেই এই মানুষটিকে আবার নিজের দলে টেনেছেন। বিগ মিনের সহকর্মীদের সম্পর্কে খানের মনোভাব যা-ই হোক স্বয়ং মিনকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। মিনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি উপাসনালয়ে গিয়েছিলেন, মিনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি জনসাধারণের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মিন এখন তাঁর প্রধান সহায়।

যুদ্ধে পটু, রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ, নগুয়েন খানের সবচাইতে বড় অসুবিধে এই যে, দেশের মানুষদের অনেকেই তাঁকে চেনে না। তিনি নিজেও যে তাদের সবিশেষ পরিচয় রাখেন এমন নয়। কিন্তু অবস্থাগতিকে এখন তাঁকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁর স্বদেশের এবং স্বজাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার খবর নিতে হচ্ছে, সায়গন থেকে গ্রামাঞ্চলে যেতে হচ্ছে, সর্বসাধারণের সঙ্গে মিশতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যে একবার বেন ক্যাটে গিয়ে সেখানকার বাচ্চাদের মধ্যে বিস্তর লজেন্স

আর চকোলেটও বিলিয়েছেন তিনি। লড়ুয়ে মানুষ হঠাৎ এইভাবে সান্তা ক্লজের ভূমিকায় নামলেন কেন? বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, রাতারাতি তিনি জনপ্রিয় হতে চাইছেন।

হওয়া দরকার। কেননা, দেশের মানুষদের মধ্যে অনেকেই তাঁর বিদ্রোহকে বিশেষ সুনজরে দেখেনি। কেউ-কেউ বলছে, এর সঙ্গে কোনও আদর্শ কিংবা নীতির প্রশ্ন জড়িত ছিল না, আসলে এটা নেহাতই ব্যক্তিগত উচ্চাশার ব্যাপার। খানের বিদ্রোহের পরে সৈন্যবাহিনীর একজন অফিসার নাকি বড় তেতো একটা মন্তব্য করেছিলেন। বলেছিলেন, "এতে করে শুধু এই কথাটাই প্রমাণিত হল যে, সৈন্যবাহিনীর মধ্যে একতা নেই।...অফিসাররা এখন রাজনীতির খেলায় মত্ত হয়ে উঠেছে। আবার এরা নিজেদের মধ্যে লড়াই বাধাবে।"

অথচ লড়াইটা কিন্তু নিজেদের মধ্যে হবার কথা ছিল না। কথা ছিল, দক্ষিণ ভিয়েতনামের সৈন্যরা এবারে ভিয়েত কং গেরিলাদের বিরুদ্ধে আরও ভাল করে লড়বে। সেই কমিউনিস্ট-বিরোধী লড়াইয়ের কী হল? সত্যি বলতে কী, সেই আসল লড়াইয়ের গতিক বিশেষ সুবিধের নয়। দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে এক মার্কিন পত্রিকার সংবাদদাতা যে খবর পাঠিয়েছেন তাতে মনে হয়, বিস্তর কমিউনিস্ট এজেন্ট এখন দক্ষিণী সৈন্যদলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কমিউনিস্ট অনুপ্রবেশের হাত থেকে গ্রামগুলিকে যাদের বাঁচাবার কথা, সেই রক্ষী-বাহিনীও নাকি নিরুৎসাহ। লড়াই করবার মতন উদ্যম তাদের নেই।

ভিয়েত কং গেরিলারা এই টালমাটাল অবস্থার সুযোগ নিতে, বলাই বাহুল্য, দেরি করেনি। দক্ষিণ ভিয়েতনামে রাজনৈতিক পালা-বদলের দিন কয়েক বাদেই, সায়গনের উত্তর-পশ্চিমে, তারা প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে খানের বাহিনীর শতাধিক সৈন্য তাদের হাতে মারা পড়েছে। খানের সৈন্যরা আর-এক

জায়গাতেও গেরিলাদের হাতে পর্যুদস্ত হয়। রাত্রির অন্ধকারে আক্রমণ চালিয়ে গেরিলারা মাত্র মিনিট কুড়ির মধ্যে সেখানে লড়াই ফতে করেছিল।

ওয়াশিংটনের পক্ষে এতে উদ্বিগ্ন হওয়াই স্বাভাবিক। উদ্বেগের আর-একটা কারণ এই যে, খাস সায়গনে ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট এজেন্টদের দাপট আরও বেড়েছে। ইতস্তত তারা চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাচ্ছে, এবং মার্কিন নাগরিকরাই সেই আক্রমণের লক্ষ্য। কিন দো ছবিঘরের বিস্ফোরণটাই সবচাইতে মারাত্মক। একাধিক মার্কিন সেনা তাতে নিহত হয়েছে। আহতের সংখ্যা পঞ্চাশের বেশী।

সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করা, মার্কিন নাগরিকরা যাতে ভিয়েতনামে থাকতে সাহস না পায়। সায়গনে তাই বিস্তর বোমা আর হ্যাণ্ডগ্রেনেড পাচার করা হচ্ছে। বাইরে থেকে গোপনে সেগুলি নিয়ে আসা হচ্ছে; কারা আনছে, টের পাওয়া যাচ্ছে না। তা ছাড়া ছড়ানো হচ্ছে ইস্তাহার। তাতে লেখা: রোজ দুটি করে আমেরিকানকে ঘায়েল করা চাই।

মার্কিন পররাষ্ট্র-দপ্তরের একজন মুখপাত্র এ-সম্পর্কে বলেছেন, "যাই ঘটুক, আমরা ভয় পাব না।" ভাল কথা। কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েতনামের নতুন নায়ক খান যদি না ভিয়েত কং গেরিলাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেন, তবে ওয়াশিংটনের পক্ষে খুব উৎফুল্ল হওয়াও সম্ভব নয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, নগুয়েন খান এঁটে উঠতে পারবেন কিনা। এ-কথার উত্তর একমাত্র ভবিষ্যতই দিতে পারে। আপাতত দেখা যাচ্ছে যে, দক্ষিণ ভিয়েতনামের যাঁরা কর্তাব্যক্তি, কমিউনিস্ট-বিরোধী যুদ্ধের চাইতে সেমসাইড গোলেই তাঁরা বেশী পটু।

গান্ধী-মহারাজের শিষ্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছোট্ট একটি ছেলে। বাসে চড়ে সে আটলাণ্টায় যাচ্ছিল। সঙ্গে ছিলেন তার মাস্টারমশাই। কৌতূহলী ছেলেটি তাকে একটার-পর-একটা প্রশ্ন করছিল। মাস্টারমশাই তার উত্তর দিচ্ছিলেন।

মাঝপথে নতুন কিছু যাত্রী বাসে উঠল। সাদা যাত্রী।

স্টীয়ারিং হুইল থেকে মুখ ফিরিয়ে বাসের ভিতরে তাকাল ড্রাইভার। ছোট্ট ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল, "আসন ছেড়ে দাও।"

"কেন ?"

"এইটেই নিয়ম !" ড্রাইভার জানিয়েছিল, "সাদারা যখন বাসে ওঠে, কালোদের তখন জায়গা ছেড়ে দিতে হয়।"

নিয়ম ! ছেলেটি এই অদ্ভুত নিয়মের কোনও অর্থ খুঁজে পায়নি। বলেছিল, "যারা পরে উঠেছে, তারা দাঁড়িয়ে যাবে। আমরা আগে উঠেছি, আমরা বসে যাব। আমরা জায়গা ছাড়ব না। দাঁড়িয়ে যদি যেতে হয় তো ওরা যাক।"

"কুত্তীর কালো বাচ্চা !" রাগে খেঁকিয়ে উঠেছিল সাদা ড্রাইভার। "ভাল চাস্ তো আসন ছেড়ে দে !"

ছেলেটি তবু আসন ছাড়েনি। ছাড়তও না, যদি না তার মাস্টার-মশাইও তাকে জায়গা ছেড়ে দিতে বলতেন।

"কী করা যাবে বলো। এ খুব খারাপ আইন, কিন্তু এইটেই আইন। আমরা আইন লঙ্ঘন করতে পারি না, মার্টিন। উই মাস্ট্ ওবে দি ল।"

আইন নয়, মাস্টারমশাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধাবশত ছেলেটি সেদিন

জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল। আটলাণ্টা তখনও নব্বুই মাইল দূরে। সেই নব্বুই মাইলের মধ্যে সে আর আসন গ্রহণ করেনি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো নেতা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের সে-কথা আজও মনে আছে। আজও তিনি বলেন, "সেই রাত্রির কথা, সেই অপমানের কথা ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। জীবনে আর কখনও আমি এতটা ক্রুদ্ধ হইনি।"

ক্রুদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা, নামে যিনি কিং, আচরণেও তিনি রাজা। অন্যকে তিনি রাজার মতন সম্মান করতে জানেন; এবং অন্যের কাছেও তিনি রাজার মতনই সম্মান চান। প্লুটার্কের লেখা সিকন্দর-জীবনীর সেই বিখ্যাত ঘটনাটির কথা মনে পড়ছে। শৃঙ্খলিত পুরুরাজকে সিকন্দর জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী রকমের আচরণ তিনি আশা করেন। পুরু বলেছিলেন, রাজার মতন।

কিংয়ের নেতৃত্বে মার্কিন নিগ্রো-সমাজও সেই একই কথা বলছে। তাদের শৃঙ্খল অনেকদিন আগেই খসেছে। কিন্তু আচরণের বৈষম্য তবু বিদায় নেয়নি। কিং বলছেন, এই বৈষম্য অমানবিক, একে বিদায় দিতে হবে।

এবং অবিলম্বে।

নেতা হিসেবে দারুণ রকমের চালাক নন। সংগঠক হিসেবেও আপন প্রতিষ্ঠানে তাঁর খ্যাতি খুবই সামান্য। কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ মানুষ আর নির্ভীক বক্তা হিসেবে অসামান্য তাঁর প্রতিষ্ঠা। কিংয়ের বক্তৃতার মধ্যে কথোপকথনের একটা সহজ ভঙ্গি থাকে। শ্রোতাদের তিনি প্রশ্ন করেন, উত্তর চান; উত্তর শুনে তারপর পথের নির্দেশ দেন। এতই স্পষ্ট এবং ঋজু সেই নির্দেশ যে, অবিশ্বাসীরাও অভিভূত না-হয়ে পারেন না। বিদেশী পত্রিকায় তাঁর বক্তৃতার কিছু নমুনা বেরিয়েছে; এখানে তুলে দিচ্ছি।

কিং: ওরা তোমাদের মারছে। তাই না?

সমবেত উত্তর : হ্যাঁ, হ্যাঁ।

কিং : ওরা তোমাদের গালাগাল দিচ্ছে। তাই না?

সমবেত উত্তর : হ্যাঁ, হ্যাঁ।

কিং : ওরা তোমাদের ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকছে ; ঢুকে তোমাদের উপরে অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে। তাই না?

সমবেত উত্তর : হ্যাঁ, হ্যাঁ।

কিং : তোমাদের কারো-কারো হাতে ছুরি আছে। কিন্তু আমি বলছি, ছুরিগুলোকে তোমরা তুলে রাখো। তোমাদের কারো-কারো হাতে হয়ত অন্যান্য অস্ত্র আছে। কিন্তু আমি বলছি, সেই অস্ত্রগুলিকেও তোমরা তুলে রাখো। অস্ত্র যদি নিতেই হয় তো অহিংসার অস্ত্র নাও। সততা তোমাদের বর্ম হোক। সত্যের ঢাল হাতে নাও তোমরা। তারপর এগিয়ে চলো।"

অহিংসা। সততা। সত্য।

কিংয়ের বক্তৃতায় যদি গান্ধী-বাণীর প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়, তবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কেননা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই কালো 'রাজা' আসলে গান্ধী-মহারাজেরই শিষ্য। আটলাণ্টায় তাঁর বাড়িতে গেলে দেখা যাবে, দেয়ালের উপরে একটি ছবি টানানো রয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর ছবি।

কিং বলেন, "আমি খ্রীষ্টের অনুগামী। গান্ধী আমাকে পথের সন্ধান দিয়েছেন।"

জন্ম ধর্মযাজকের ঘরে। বয়স পঁয়ত্রিশ। পরনে কালো স্যুট। গলায় কালো টাই। পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি দীর্ঘ এই মানুষটির মধ্যে অসাধারণত্বের কোনও ব্যঞ্জনা নেই। কিন্তু কথা বলতে বলতে যখন চোখ তুলে তাকান, দৃষ্টিতে তখন এক অসাধারণ আলো হঠাৎ জ্বল-জ্বল করে ওঠে। দেখে বুঝতে পারা যায়, তাঁর বুকের মধ্যে বিশ্বাসের আগুন জ্বলছে। কিং বিশ্বাস করেন, ঈশ্বরের রাজ্যে সমস্ত মানুষই

সমান, বর্ণবৈষম্যের স্থান সেখানে নেই। কিং বিশ্বাস করেন, সেই বৈষম্যকে দূর করতে হবে। দূর করতে গিয়ে, ইতিমধ্যেই তিনি বর্ণান্ধদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছেন। তারা তাঁকে ভয় দেখিয়েছে, ছোরা মেরেছে, বাড়িতে বোমা ফেলেছে। তা ছাড়া, গত কয়েক বছরের মধ্যেই, চোদ্দবার কারারুদ্ধ হয়েছেন তিনি। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস তবু টলেনি।

বিশ্বাসের প্রথম পরীক্ষা হয়েছিল আজ থেকে আট বছর আগে; ১৯৫৫ সনের ডিসেম্বর মাসে। কিংয়ের বয়স তখন সাতাশ।

আলাবামার মণ্টগোমারি শহরে এক নিগ্রো মহিলা সেদিন বাসে চড়ে তাঁর বাড়িতে ফিরছিলেন। ভদ্রমহিলার নাম মিসেস পার্ক্স্। মাঝপথে কিছু শ্বেতাঙ্গ যাত্রী বাসে উঠতেই ড্রাইভার নির্দেশ দিল, কালা আদমীদের উঠে দাঁড়াতে হবে, সাদাদের জন্যে আসন ছেড়ে দিতে হবে। নির্দেশটা নতুন নয়। কিন্তু পুরনো অপমানকে অন্তত একজন যাত্রী সেদিন নতুন করে মেনে নেননি। তিনি মিসেস পার্কস। নির্দেশটা তিনি মান্য করলেন না। অন্যান্য কৃষ্ণাঙ্গরা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার পরেও তিনি নিজের আসনে অনড় হয়ে বসে রইলেন। পরিণামে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। আদালত রায় দিল, আইন অমান্য করবার অপরাধে তাঁকে দশ ডলার জরিমানা দিতে হবে।

আইন! মাস্টারমশাইয়ের অনুরোধ কিং একদিন আইন মেনে তাঁর আসন ছেড়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু যে-আইন মনুষ্যত্বের পরিপন্থী, তার কাছে নতিস্বীকারের বেদনা তিনি ভুলতে পারেননি। আর তাই, মিসেস পার্কসের ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে যখন মণ্টগোমারির নিগ্রোদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আন্দোলনের সূত্রপাত হল, কিং তখন সেই আন্দোলনের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

পরের ইতিহাস সকলেই জানে। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, অন্যান্য দেশের সংবাদপত্রেও মোটা হরফের হেডলাইনে সেই ইতিহাসকে ধরে

রাখা হয়েছে। মণ্টগোমারির নিগ্রোরা স্থির করলেন, বাস-সার্ভিস তাঁরা বয়কট করবেন। তা-ই করেছিলেন তাঁরা, এবং বাস-কোম্পানিকে তার ফলে প্রায় পথে বসতে হয়েছিল।

কিংয়ের বাড়িতে সেইসময় বোমা পড়ে। কিন্তু কিং তাতে বিচলিত হননি। বরং উত্তেজিত নিগ্রোদের তিনি শান্ত করে রেখেছেন। আন্দোলনের মধ্যে হিংসার আভাস দেখবামাত্র বলেছেন, না, এ-পথে নয়। বলেছিল, "প্ররোচনা যতই তীব্র হক, আমরা অহিংস থাকব।"

অহিংস আন্দোলন শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করেছিল। সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়েছেন, আলাবামার বাসে সাদা আর কালোদের মধ্যে যে বিভেদ ঘটানো হয়েছে, তা অন্যায়। চামড়ার রঙ সাদাই হক আর কালোই হক, সকল যাত্রীকে সমান চোখে দেখতে হবে। তাদের মধ্যে একটা ব্যবধানের দেয়াল গড়ে তোলা চলবে না।

মণ্টগোমারিতে যার শুরু, সেই আন্দোলন এই প্রাথমিক সাফল্যের পরেই স্তব্ধ হয়ে যায়নি। বরং দিনে দিনে তার পরিধি আরও বিস্তৃত হয়েছে, শক্তি হয়েছে প্রবলতর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কালো মানুষদের মধ্যে কিং ইতিমধ্যে এই দারুণ আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে দিয়েছিলেন যে, জয় তাদের অনিবার্য; সমানাধিকারের সুদিন এবারে আসবেই। বছর কয়েকের জন্য এখানে-ওখানে বিচ্ছিন্নভাবে বিক্ষোভ চালাবার পরে বার্মিংহামকে তাঁর পরবর্তী আন্দোলনের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলেন তিনি। গত বছরের কথা। নিগ্রো-বিক্ষোভ সেখানে তখন চরমে উঠেছিল; ব্যবধানের প্রাচীর হয়ে উঠেছিল তুঙ্গতম। কিং ঘোষণা করলেন, সেই প্রাচীরের উপর তিনি তাঁর অহিংস আন্দোলনের আঘাত হানবেন। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই প্রাচীর ধূলোয় ধসে পড়ছে, ততক্ষণ তিনি থামবেন না।

অতঃপর যে দৃশ্যের অবতারণা হল, নির্মমতায় তার তুলনা নেই। পুলিসী নির্মমতার নেতৃত্ব নিয়েছিলেন বুল কনর। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে

যারা বর্ণান্ধ, তাদের নিষ্ঠুরতার সেদিন সীমা ছিল না। নিগ্রোদের বাড়ির উপরে তখন বোমা পড়েছে, নিগ্রোদের উপরে তখন হিংস্র কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে, ফায়ার হোসের সাহায্য নিয়ে নিগ্রো-মিছিলকে তখন ছত্রভঙ্গ করা হয়েছে। বন্দুক গর্জে উঠেছে; পথের উপরে লুটিয়ে পড়েছে কালো মানুষের মৃতদেহ।

আন্দোলন কি তবু স্তব্ধ হয়েছিল? তবু হয়নি। তবু দেখা গিয়েছিল, দলে দলে এগিয়ে আসছে কালো মানুষের সারি। পরনে পরিচ্ছন্ন পোশাক, মুখে গান। যেন রাজনৈতিক কোনও আন্দোলনে নয়, পবিত্র কোনও উৎসবে তারা যোগ দিতে এসেছে। উৎসবই বটে। অপমানের আবর্জনাকে পুড়িয়ে দিয়ে সম্মানিত জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার উৎসব। গান গাইতে গাইতে তাই পুলিসের হাতে ধরা দিয়েছে তারা; হাসি-মুখে কারাবরণ করেছে। বার্মিংহামের সেই আন্দোলনে যোগ দেবার 'অপরাধে' যে-সব নিগ্রোকে সেদিন কারারুদ্ধ করা হয়েছিল, তাদের সংখ্যা তিন হাজারেরও বেশী। বলা বাহুল্য নিগ্রোদের প্রিয়তম নেতা মার্টিন লুথার কিংও তাদের সঙ্গে ছিলেন।

অনেকে বলেছেন, এত তাড়াতাড়ি এই বিরাট আন্দোলন শুরু করা কিংয়ের পক্ষে উচিত হয়নি। এমন কী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু নিগ্রো-প্রেমিক শ্বেতাঙ্গ ধর্মযাজকও বলেছেন যে, কিংয়ের পক্ষে আরও কিছুদিন সবুর করা উচিত ছিল। এই মন্তব্যের উত্তরে, বার্মিংহাম কারাগার থেকে একটি চিঠি লিখেছিলেন কিং। টয়লেট-পেপার আর ছেঁড়া কাগজের উপরে লেখা সেই চিঠিখানিকে টুকরো-টুকরো করে তাঁর সঙ্গীরা, গোপনে, জেলের বাইরে নিয়ে আসেন। তার একাংশ এখানে উদ্ধৃত করছি:

"যে অধিকার সাংবিধানিক ও ঈশ্বর-প্রদত্ত, তার জন্যে আমরা সাড়ে তিন শ বছরেরও বেশী দিন অপেক্ষা করেছি। এশিয়া আর আফ্রিকার জাতিগুলি আজ দ্রুতবেগে তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার দিকে

এগিয়ে চলেছে। অথচ আজও এক কাপ কফির জন্য লাঞ্চ-কাউন্টারে গিয়ে আমাদের পা টিপে-টিপে এগোতে হয়। বর্ণ-বিভেদের নিদারুণ অপমান যাঁদের কখনও সহ্য করতে হয়নি, খুব সহজেই তাঁরা বলতে পারেন, 'সবুর করো।'

"কিন্তু চোখের সামনে যদি আপনারা দেখতেন যে, উন্মত্ত জনতা আপনাদের বাপ-মাকে পিটিয়ে মারছে; যদি দেখতেন যে, আপনাদের ভাই-বোনকে তারা জলে ডুবিয়ে দিচ্ছে; যদি দেখতেন যে, হিংসায় উন্মত্ত পুলিসরা আপনাদের কালো ভাই-বোনদের গালাগাল দিচ্ছে, লাথি মারছে, ঠেঙাচ্ছে, খুন করছে; টেলিভিশনে যে প্রমোদ-উদ্যানের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে, আপনাদের ছোট্ট মেয়েটির যে কেন সেখানে যাবার অধিকার নেই, তা তাকে বুঝিয়ে বলতে গিয়ে যদি আপনাদের জিহ্বা জড়িয়ে যেত এবং বাক্-রোধ হত; 'ফানটাউনে'র দরজা যে কালো শিশুদের জন্য বন্ধ, এই কথা তাকে জানিয়ে দেবার পরে যদি আপনারা দেখতেন যে, তার চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছে; যদি দেখতেন যে, তার মনের আকাশে ধীরে ধীরে হীনম্মন্যতার মেঘ জমছে, এবং নিজেরই অজান্তে সাদা মানুষদের সম্পর্কে তিক্ততা তার ব্যক্তিত্বকে ধীরে ধীরে বিকৃত করছে; 'সাদা' আর 'কালো'—বারবার এই মার্কা দুটি দেখে-দেখে যদি প্রতিনিয়ত আপনারা অসম্মানিত হতেন্; আপনাদের প্রথম নাম যদি হত 'নিগার', দ্বিতীয় নাম 'বয়' (তা আপনাদের বয়স যতই হক না কেন), আর শেষ নাম 'জন,' এবং আপনাদের স্ত্রী আর মাকে যদি 'মিসিজ' সম্বোধনের সম্মান কেউ না দেখাত; আপনারা যে নিগ্রো শুধু এই কারণেই যদি দিবারাত্রি আপনারা নির্যাতিত হতেন; সারাক্ষণ যদি আপনাদের ভয়ে-ভয়ে থাকতে হত…এবং এক আত্মনাশা 'তুচ্ছতাবোধ'-এর বিরুদ্ধে যদি সারাক্ষণ আপনাদের সংগ্রাম করতে হত—একমাত্র তাহলেই আপনারা বুঝতে পারতেন যে, কেন আমরা আর সবুর করতে পারছি না।"

বলা বাহুল্য নিগ্রোদের সেই বিপুল বিক্ষোভ সেদিন শুধু

বার্মিংহামেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অসংখ্য অঞ্চলে তার তরঙ্গ সেদিন ছড়িয়ে পড়েছিল। একটা কথা এখানে বলা দরকার। সেটা এই যে, মার্কিন বর্ণ-বৈষম্যের দায়িত্ব প্রধানত বিভিন্ন অঙ্গরাষ্ট্রের শাসকদের, এবং সেইসব বর্ণান্ধ সাদা মানুষের, নিগ্রোদের যারা মানুষ বলেই মনে করে না। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকার সেক্ষেত্রে নিগ্রোদের দাবি সম্পর্কে উদাসীন নন। এবারে এই বিক্ষোভের পরে নিগ্রোদের সমর্থনে এগিয়ে আসা তাঁদের পক্ষে আরও সহজ হল। প্রেসিডেন্ট কেনেডির নির্দেশে জাস্টিস ডিপার্টমেণ্ট দ্রুত একটি বিল রচনা করলেন। নিগ্রোদের জন্য সমানাধিকারের ব্যবস্থা করা এবং বর্ণ বৈষম্যের বিলোপই তার লক্ষ্য।

কিংয়ের নেতৃত্ব ব্যর্থ হয় নি। ব্যর্থ হয়নি লিঙ্কন স্মৃতিস্তম্ভের সামনে লক্ষ লক্ষ কালো মানুষের অবিস্মরণীয় সমাবেশ। দলে দলে তারা সেই নিগ্রো-দরদী মহা-মানবের স্মৃতিস্তম্ভের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। যিনি যেদিন ডাক দিয়েছিলেন তাদের, কালো মানুষ আর সাদা মানুষের সকল পার্থক্য তিনিও, ঠিক লিঙ্কনের মতনই, ঘুচিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি কেনেডি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরুণতম প্রেসিডেন্ট।

কেনেডি বেঁচে নেই। নিগ্রো-বিরোধীদের ঘৃণার আগুন তাঁর বিরুদ্ধে লেলিহান হয়ে উঠেছিল। আততায়ীর রাইফেল তাঁকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট জনসন তাঁর পূর্বসূরীর ইচ্ছাকে জয়যুক্ত করতে পারবেন কিনা। সাদা মানুষ আর কালো মানুষের ব্যবধান তিনি ঘুচিয়ে দিতে পারবেন কিনা। এখনও যাদের বর্ণাভিমান প্রবল, নিগ্রো-বিদ্বেষে এখনও যারা অন্ধ. দেয়ালের লিখনকে এখনও যারা পড়তে পারছে না, তাদের মূঢ় মত্ততার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিগ্রোদের জন্য সমানাধিকারের ব্যবস্থা তিনি করতে পারবেন কিনা।

কিংয়ের ধারণা, পারবেন। জনসন সম্পর্কে তিনি বলেছেন, তাঁকে আমি ভাল করেই চিনি। "হি মীনস্ বিজনেস্।"

'ক্যাপ্টেন ! মাই ক্যাপ্টেন !'

প্রতিটি ছবিই খুব স্পষ্ট। তবু তারই মধ্যে, অন্যান্য ছবির তুলনায়, যেন একটি ছবি আরও বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সবাইকে ফাঁকি দিয়ে, সকলের চোখ এড়িয়ে, তার বাবার অফিস-ঘরে এসে ঢুকে পড়েছে ছোট্ট একটি ছেলে। পরনে নিকার-বোকার; মাথায় আলুথালু চুল; মুখে অহঙ্কারের হাসি। চেয়ার ছেড়ে উঠে এসেছেন তাঁর বাবা; টেবিলের উপরে এসে বসেছেন। সামনে হাত বাড়িয়ে দিয়ে কৌতুকে স্নিগ্ধ চোখে দেখছেন, নরম কার্পেটের মধ্যে পা ডুবিয়ে, গর্বিত ভঙ্গিতে, টালমাটাল হাঁটছে তাঁর দামাল ছেলে। যেন বলছে, "ত্মাখো, আমি হাঁটতে পারি।"

জন-জুনিয়রের বয়স এবারে তিন পূর্ণ হল। কিন্তু, তার দামাল ভঙ্গি দেখিয়ে, বাবার কর্মব্যস্ত সময়কে সে আর কখনও হাসিয়ে দিতে পারবে না। চেয়ার ছেড়ে তার বাবা আর কখনও টেবিলের উপরে এসে বসবেন না। দু দিন আগেও যে-ছেলে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াত, নিজের পায়ে তাকে হাঁটতে দেখে আর কখনও কৌতুক স্নিগ্ধ হয়ে উঠবে না তাঁর মুখ।

কেন উঠবে না, তা আজ সবাই জানে। টেক্সাসের এক সুন্দর অপরাহ্নের শান্তিকে চমকে দিয়ে হঠাৎ রাইফেল গর্জে উঠেছিল। শিশুকে তার নিজের পায়ে দাঁড়াতে দেখে যে-মুখ হাসিতে ভরে উঠত, আততায়ীর রাইফেল সেই সুন্দর মুখখানিকে সেদিন রক্তে ভাসিয়ে দিয়েছে।

"ও ক্যাপ্টেন! মাই ক্যাপ্টেন!"

ওয়াল্ট হুইটম্যান বেঁচে নেই। কিন্তু বেঁচে আছে তাঁর কবিতা। আব্রাহাম লিঙ্কনের মৃত্যুতে যে কবিতা তিনি লিখেছিলেন, জন

ফিটজেরাল্ড কেনেডির মৃত্যুতেও সেই অমর কবিতারই একটি পংক্তি আজ আবার সন্তপ্ত আমেরিকার কানে ঝঙ্কৃত হচ্ছে।

"ও ক্যাপ্টেন! মাই ক্যাপ্টেন!"

ডালাসের সাদা মসৃণ পথের উপর দিয়ে এগিয়ে আসছিল সেই মোটরের মিছিল। প্রেসিডেন্টের মিছিল। আর সেই মিছিলের মধ্যে গাঢ় নীল রঙের বিরাট একটি লিঙ্কন গাড়িতে বসে ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরুণতম প্রেসিডেন্ট। পাশে স্ত্রী জাকলিন। দুজনেই হাসছিলেন। একটু বাদেই সে-হাসি মুছে যাবে, তা কেউ জানত না।

কেনেডি সেদিন টেক্সাসের হৃদয় জয় করতে এসেছিলেন। তিনি জানতেন, তাঁর নিগ্রো-প্রীতিকে এই দক্ষিণী অঞ্চলটি কখনও সুনজরে দেখেনি। টেক্সাসে যে নিগ্রো-বিদ্বেষ বড় প্রবল, তা তাঁর অজানা ছিল না। তিনি শুনেছিলেন, কৃষ্ণকায়দের সম্পর্কে তাঁর প্রীতির নীতির কথা জেনে টেক্সাসের হৃদয় ক্রমে আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, বিগত নির্বাচনে কেনেডি জয়লাভ করেছিলেন বটে, কিন্তু টেক্সাসের এক বিপুল অংশের তাতে সায় ছিল না। টেক্সাসের বড় শহর ডালাস। ষাটের নির্বাচনে ডেমোক্রাট কেনেডি সেখানে এক লক্ষ ভোটও পাননি; কিন্তু রিপাবলিকান নিক্সন পেয়েছিলেন প্রায় দেড় লক্ষ ভোট। তবু এসেছিলেন কেনেডি। হয়ত সেইজন্যেই এসেছিলেন। ডেমোক্রাট দলকে শক্তিশালী করে তুলবার জন্যে টেক্সাসকে তিনি ভালবাসার মন্ত্র শোনাতে এসেছিলেন। হয়ত ভেবেছিলেন, ভালবাসার মন্ত্র শুনিয়েই টেক্সাসের ভালবাসা তিনি জয় করতে পারবেন।

ভালবাসা!

আশ্চর্য, একটু আগেই ডালাসের যে জায়গাটিতে সেদিন এসে নেমেছিলেন কেনেডি, তার নাম লাভফীল্ড!

আশ্চর্য, গবর্নর কনালির স্ত্রী তাঁকে মাত্র একটু আগেই সেদিন বলেছিলেন, "আর আপনার পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে, ডালাস আপনাকে ভাল্‌বাসে না!"

আশ্চর্য, ডালাসের রাজপথের দুই ধারে দাঁড়িয়ে হর্ষোচ্ছল জনতা তখনও কেনেডির জয়ধ্বনি দিচ্ছিল!

কী ভাবছিলেন তখন কেনেডি? ভালবাসার কথা? একটু বাদেই আর-একটি জনসভায় তাঁর ভালবাসার নীতিকে ব্যাখ্যা করে তিনি যে বক্তৃতা দেবেন, তার কথা? নাকি জন-জুনিয়রের কথা? নাকি জন-জুনিয়রের চাইতে আরও অনেক বেশী বয়সে যারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে, এবং নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখে, টাল্‌মাটাল্‌ পায়ে যারা সমানাধিকার অর্জনের জন্যে ছুটে আসছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেই অসংখ্য কৃষ্ণকায় মানুষের কথা?

পথের দুই ধারে জনতা তখনও হাততালি দিচ্ছিল।

আর তারই মধ্যে হঠাৎ গর্জে উঠল একটি রাইফেল।

আততায়ীর রাইফেল সেদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। গুলি লেগেছিল প্রেসিডেণ্ট কেনেডির মাথায়। গুলি লেগেছিল গভর্নর কনালির বুকে। রক্তে ভেসে গিয়েছিল কেনেডির মুখ। দু হাতে বুক চেপে ধরে তিনি সামনে ঢলে পড়েছিলেন। জাকলিন চমকে উঠেছিলেন। প্রথমে তিনি কিছু বুঝতে পারেননি। তারপর রক্তাপ্লুত স্বামীকে নিজের কোলে টেনে নিয়ে, মর্মান্তিক বিস্ময়ে আর্তনাদ করে উঠেছিলেন, "ওহ্‌, নো!"

ড্রাইভার সব বুঝতে পেরেছিল। সে গাড়ি থামায়নি। সিক্রেট সার্ভিসের লোকরাও সব বুঝতে পেরেছিল। প্রেসিডেণ্টের গাড়িকে তারা থেমে থাকতে দেয়নি। মোটরের মিছিলকে তার নির্দিষ্ট পথ থেকে সরিয়ে এনে হাসপাতালের পথে চালিয়ে দিয়েছিল তারা।

পার্কল্যাণ্ড হাসপাতালে ডাক্তাররা সেদিন নিমেষের মধ্যে এসে প্রেসিডেণ্টের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনাস্থল থেকে প্রেসিডেণ্টকে হাসপাতালে নিয়ে আসতে যদিও পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগেনি, সেই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আরও অবনতি ঘটেছিল তাঁর অবস্থার। নিশ্বাস-প্রশ্বাস সহজ করবার জন্যে তাঁর শ্বাসনালীতে অস্ত্রোপচার করা হল; রক্ত দেওয়া হল; অক্সিজেন-যন্ত্রও ব্যবহার করা হল; কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রীকে তবু জীবনের বেলাভূমিতে ফিরিয়ে আনা গেল না। আনা যে সম্ভব হবে না, ডাক্তাররা তা জানতেন। আহত হবার পরে মাত্র পঁচিশ মিনিট বেঁচে ছিলেন কেনেডি। গুলি লাগবার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর চেতনা আর ফিরে আসেনি।

সহকারী প্রেসিডেণ্ট লিণ্ডন জনসন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর মুখ তখন গম্ভীর। অপেক্ষমান জনতা বুঝতে পেরেছিল, সংবাদ শুভ নয়। হোয়াইট হাউসের সহকারী প্রেস-সেক্রেটারী তার খানিক বাদেই ঘোষণা করলেন, "দি প্রেসিডেণ্ট ইজ ডেড্।"

ডালাসের রাজপথে ফিরে যাওয়া যাক। পঁচিশ মিনিট পিছিয়ে গিয়ে একবার দেখবার চেষ্টা করা যাক সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তটিকে। রাইফেল গর্জে উঠেছে; কেনেডির মুখ রক্তে ভেসে গিয়েছে; দুঃসহ যন্ত্রণায় বুক চেপে ধরেছেন তিনি; অচৈতন্য হয়ে সামনে ঢলে পড়েছেন। সেই অবিশ্বাস্য মুহূর্তের বর্ণনা দেবে কে?

বর্ণনা দিয়েছেন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের একজন ফটোগ্রাফার। বলেছেন, "হঠাৎ একটা চিৎকার শুনলাম। মনে হল, প্রেসিডেণ্টের গাড়ির জানালা দিয়ে মাংসের টুকরো উড়ে যাচ্ছে। তাকিয়ে দেখি, রক্তে ভেসে গিয়েছে কেনেডির মাথার বাঁ-দিকটা। পাশে ছিলেন তাঁর স্ত্রী জাকলিন। দেখলাম, স্বামীকে জড়িয়ে ধরে তিনি চিৎকার

করে উঠলেন। গাড়ির ড্রাইভার তৎক্ষণাৎ স্পীড বাড়িয়ে দিল। গাড়ি ছুটতে লাগল স্টেমন্স এক্সপ্রেসওয়ের দিকে। চারদিকে তখন চরম বিশৃঙ্খলা; জনতা চিৎকার করছে; জনতা ছুটছে; ছুটে আসছে পুলিসের দল। আর তারই মধ্যে প্রেসিডেন্টের গাড়ি উধাও হয়ে গেল।”

প্রেসিডেন্টের গাড়ি ছুটছিল হাসপাতালের পথে। ঘণ্টায় সত্তর মাইল স্পীডে, এবং রাস্তার উপরে বাঁক নেবার সময়েও গতিবেগ কিছুমাত্র না-কমিয়ে, ছুটছিল। আর তার খানিক বাদেই পুলিস ছুটল রাস্তার ধারের সেই সাত-তলা বাড়িটির দিকে, যার ছ-তলার জানালায় একটি রাইফেলের নল পলকে দেখা দিয়েই আবার অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। (একজন শ্বেতাঙ্গ পথচারী আর একটি নিগ্রো ছেলে সাক্ষ্য দিয়েছে, পথের ধারের সেই বাড়ির জানালায় তারা একটি মানুষকে দেখেছিল। তার হাতে ছিল বন্দুক।) বাড়িটিকে ঘিরে ফেলা হল; বাড়ির বাসিন্দাদের একে একে পরীক্ষা করা হল; ৬-৫ মিলিমিটারের একটি ইতালিয়ান রাইফেলও পাওয়া গেল সেই বাড়ির ছ-তলার ল্যাণ্ডিংয়ের কাছে। কিন্তু কে যে তার ট্রিগার টেনেছিল, তা জানা গেল না। লী হার্ভে অসওয়াল্ড তখনও পুলিসের সন্দেহের লক্ষ্য হয়নি। সাত-তলা সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবার সময়, পুলিসের প্রশ্নের উত্তরে, সে বলেছিল, “আমি এখানে কাজ করি।” আর-একজন বাসিন্দা তার উক্তির সমর্থনে জানিয়েছিল, কথাটা মিথ্যে নয়।

পুলিস তখন তাকে গ্রেপ্তার করেনি।

গ্রেপ্তার করল আরও কিছুক্ষণ পরে। মিসেস মারখাম নাম্নী এক ভদ্রমহিলার কাছে খবর পাওয়া গেল, কেনেডি যখন গুলিবিদ্ধ হন, তার পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে, ঘটনাস্থল থেকে মাইল চারেক দূরে তিনি এক [illegible]র দৃশ্য দেখেছেন।

“স্টপে দাঁড়িয়ে আমি বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। রাস্তা দিয়ে একটি লোক যাচ্ছিল। এমন সময় একটি পুলিসের গাড়ি এসে

দাঁড়াল। গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পুলিস-অফিসার সেই পথচারীকে কী যেন জিজ্ঞেস করলেন। পথচারী এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে। কী যেন বলল। অফিসার তাঁর গাড়ি থেকে নামলেন। পথচারীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। তার দিকে তাকালেন। লোকটিও তাঁর দিকে তাকাল। তারপরেই একটা পিস্তল উঁচিয়ে ধরল সে। দেখলাম পথচারীর গুলিতে সেই পুলিস-অফিসার হঠাৎ রাস্তায় লুটিয়ে পড়েছেন।”

মিসেস মারখামের কাছে থেকে খবর পেয়ে পুলিস যখন ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছল, নিহত পেট্রোলম্যান টিপিট তখনও রাস্তার উপরে লুটিয়ে পড়ে ছিলেন।

তার খানিক বাদেই পুলিস-হেডকোয়ার্টার্সের ফোন বেজে উঠল আবার। ফোন করছিলেন এক সিনেমা-হাউসের ম্যানেজার।

“একটু আগেই একটি লোক এসে আমার ছবিঘরে ঢুকেছে। টিকিট দেখে দর্শকদের যারা আসনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেয়, তাদের একজন বলছে যে, এই নতুন আগন্তুকের হাবভাব খুবই সন্দেহজনক। লোকটা নাকি ভীষণ ছটফট করছে আর ক্রমাগত তার আসন পাল্টাচ্ছে।”

পেট্রোলম্যান টিপিট যেখানে নিহত হয়েছিলেন, তার মাত্র কয়েকটি ব্লক দূরেই ‘টেক্সাস’ সিনেমা-হল। পুলিস গিয়ে সেই ছবিঘরকে তৎক্ষণাৎ ঘিরে ফেলল। কয়েকজন অফিসার ভিতরে ঢুকলেন, পরপর সবাইকে জেরা করতে লাগলেন। জেরা করতে-করতে যখন তাঁরা এক যুবকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, সীট থেকে লাফিয়ে উঠে হঠাৎ একটা পিস্তল বার করল সে। কিন্তু ট্রিগার টানা সত্ত্বেও গুলি ছুটল না। গুলি ফুরিয়ে গিয়েছিল। হাতকড়া পরাতে অতঃপর দেরি হয়নি। যুবকটি তখন নাকি বিড় বিড় করে বলছিল, “[illegible]স্ অল ওভার।”

‘টেক্সাস’ সিনেমা-হলে যাকে গ্রেপ্তার করা হল, তার নাম লী হার্ভে

অসওয়াল্ড। কেনেডি যখন গুলিবিদ্ধ হন, তার খানিক বাদে, পুলিস-প্রহরীদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে, পথের ধারের সেই বাড়ি থেকে সে বেরিয়ে এসেছিল।' কিন্তু, আগেই বলেছি, পুলিস তখন তাকে সন্দেহ করেনি।

পার্কল্যাণ্ড হাসপাতালে ফিরে যাই। ফিরে গিয়ে সেই মানুষটিকে এবারে দেখি, মৃত্যু এসে যাঁর জীবনযন্ত্রণাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন জাকলিন। তাঁর পোশাক তখনও স্বামীর রক্তে রঞ্জিত। তাঁর দৃষ্টি তখনও বিহ্বল।

ধীর পায়ে তিনি এগিয়ে এলেন। স্বামীর শয্যার উপরে নুয়ে পড়ে তাঁর নিষ্প্রাণ ঠোঁটের উপরে ঠোঁট রাখলেন। বিয়ের আংটিটিকে নিজের আঙুল থেকে খুলে নিয়ে স্বামীর আঙুলে পরিয়ে দিলেন তিনি।

No more for him life's stormy conflicts.
Nor victory, nor defeat—
no more time's dark events
Charging like ceaseless clouds across the sky.

ডালাস হাসপাতালের বাইরে একটি নিগ্রো মেয়ে সেদিন অঝোর ধারায় কাঁদছিল।

কান্না নেমেছিল ওয়াশিংটনে, নিউইয়র্কে, লস এঞ্জেল্‌সে। আমেরিকার শহরে আর গ্রামাঞ্চলে।

লণ্ডনের মানুষরা সেদিন দেখেছিল, শহর জুড়ে অর্ধনমিত পতাকা উড়ছে। [illegible]ীর স্বরে ঘণ্টা বাজছে ওয়েস্টমিন্‌স্টার অ্যাবিতে। ঢং ঢং ঢং। ওয়েস্টমিন্‌স্টার অ্যাবিতে শেষ ঘণ্টা বেজেছিল ষষ্ঠ জর্জের মৃত্যুর পর। অনেক বছর বাদে আবার সেই ঘণ্টা হঠাৎ বেজে উঠল।

বার্লিনের আকাশে সে-রাত্রে প্রদীপ জ্বলে উঠেছিল। যে

জ্বালিয়েছিল, সে একটি অখ্যাত মানুষ। কিন্তু কেনেডিকে সে ভালবাসত।

ইতালির প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও সেনি তাঁর দফ্‌তরে বসে কাগজেপত্রে সই করছিলেন। খবর শুনে কলম নামিয়ে রেখে আর্তস্বরে তিনি বলে উঠেছিলেন, "না, না, না, না। এই দুঃসংবাদ কিছুতেই সত্য হতে পারে না।"

ডালাসে যখন দ্বিপ্রহর, নয়াদিল্লিতে তখন মধ্যরাত্রি। মধ্যনিশীথেই সেই ভয়ঙ্কর সংবাদ পেয়েছিলেন শ্রীনেহরু। মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি বললেন, "তাঁর মৃত্যু শহিদের মৃত্যু।"

লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্ট তার পাঠিয়েছিলেন, "দুঃখের পাত্রটি হঠাৎ খুলে গিয়েছে ; আর বিশ্বের সর্বত্র তাঁর অনুরাগীদের অশ্রুজলে সেই পাত্রটি পূর্ণ হয়ে উঠছে।"

মস্কো-রেডিয়োর অনুষ্ঠান হঠাৎ থেমে গিয়েছিল। ভেসে উঠেছিল ঘোষকের গম্ভীর কণ্ঠ। "কমরেডস, আমরা আমাদের অনুষ্ঠান থামিয়ে দিয়েছি, তার কারণ নিউইয়র্ক থেকে এইমাত্র একটি শোক-সংবাদ পাওয়া গেল।" কেনেডির মৃত্যু-সংবাদ জানিয়ে দেবার পর মস্কো-রেডিয়ো আর তার পুরনো অনুষ্ঠানে ফিরে যায়নি, অনেকক্ষণের জন্যে শুধুই অর্গানের বিষণ্ণ মূর্ছনা শুনিয়ে গিয়েছে।

ওয়াশিংটন থেকে মস্কো। লণ্ডন থেকে আক্রা। নয়াদিল্লি থেকে মেলবোর্ন। একমাত্র কমিউনিস্ট চীন ছাড়া (কেনেডির মৃত্যুকে তার বিদ্রূপের বিষয় করে তুলতে লালচীনের কোনও কুণ্ঠা হয়নি) সমস্ত পৃথিবীর মানুষ সেদিন এই মর্মান্তিক সংবাদে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। নিতান্ত সাধারণ অবস্থার মানুষরাও সেদিন [illegible] বেদনা বোধ করেছিল সেই তরুণ রাষ্ট্রনায়কের জন্যে, যৌবনে যি[illegible] রাজটিকা পেয়েছিলেন, এবং সেই রাজটিকার গুরুদায়িত্ব যাঁর মুখের হাসিটিকে কখনও ম্লান করে দিতে পারেনি। যাঁকে তাঁদের অনেকেই কখনও

চোখে দেখেনি, কিন্তু যাঁর অকুতোভয় সাহসের কথা, শান্তিবাদী মনোভাবের কথা আর বর্ণনির্বিচারে সর্বমানুষের জন্যে ভালবাসার কথা সবাই শুনেছিল।

সবাই তাঁকে ভালবাসত।

না, সবাই তাঁকে ভালবাসেনি। তারা বাসেনি, যারা বিকৃতমস্তিষ্ক, শান্তির কথা যাদের চিত্তে কোনও সাড়া জাগায় না, অত্যাচারে যারা অশ্লীল উৎসাহ বোধ করে, সাদা আর কালোর কৃত্রিম তফাতটাকে যারা জিইয়ে রাখতে চায়।

কেনেডিকে হত্যা করবার চেষ্টা কি এর আগেও হয়নি? আগেও কয়েকবার হয়েছিল।

প্রথম চেষ্টা হয়েছিল ১৯৫১ সনের ডিসেম্বরে। কেনেডি গিয়েছিলেন পামবীচে, তাঁর পিতৃগৃহে। সেইখানে একদিন তাঁদের বাড়ির সামনে একটি মানুষ এসে তার গাড়িটিকে দাঁড় করায়। গাড়িতে ছিল ডিনামাইট। মার্কিন সিক্রেট সার্ভিসের প্রাক্তন চীফ মিঃ বমান একখানি বই লিখেছেন। তাতে তিনি জানিয়েছেন, স্ত্রীর জন্যেই কেনেডি সেদিন রক্ষা পেয়ে যান।

দ্বিতীয় চেষ্টা হয়েছিল ১৯৫৫ সনে। মানসিক হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া একটি মানুষ সেদিন ভয় দেখিয়ে বলেছিল, প্রেসিডেন্টকে সে হত্যা করবে।

ভয় দেখানো হয়েছিল গত বছর অক্টোবর মাসেও। বাল্টিমোর নিউজ-পোস্ট পত্রিকার অফিসে ফোন করে অজ্ঞাত একটি মানুষ সেদিন চাপা গলায় জানিয়েছিল যে, শহরের এক রাজনৈতিক সম্মেলনে কেনেডি[illegible]স হত্যা করতে চলেছে।

গত মে মাসেও এক প্রাক্তন সৈনিক বলেছিল, কেনেডিকে সে হত্যা করবে। লোকটির নাম ভার্দেল উইলিংহ্যাম। এক বছরের জন্যে তার জেল হয়ে যায়।

এখন শোনা যাচ্ছে, গত বছর মে মাসে কেনেডি যখন মেক্সিকো সফরে যান, তখনও তাঁকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। মেক্সিকোর যে পথ দিয়ে কেনেডির যাবার কথা ছিল, এক যুবক এসে সেই পথের ধারের এক হোটেলে ওঠে। তার সঙ্গে ছিল একটি বাক্স, আর সেই বাক্সের মধ্যে ছিল একটি রাইফেল। ঠিক করা হয়েছিল, হোটেল থেকে রাইফেল চালিয়ে কেনেডিকে হত্যা করা হবে। মেক্সিকো-পুলিসের তৎপরতায় তার চক্রান্ত সেদিন ফেঁসে যায়। যুবকটিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, কিন্তু গ্রেপ্তারের খবর প্রকাশ করা হয়নি। মেক্সিকোর একটি সংবাদপত্র এই খবর দিয়েছে।

বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, উদারতার আদর্শকে যারা ভয় পায়, অনেক দিন থেকেই তাদের রাইফেল এই সাহসী মানুষটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

মৃত্যু যে তার পিছু নিয়েছে, কেনেডি কি তা জানতেন না? জানতেন। কিন্তু অনুদারতার সঙ্গে তবু আপস করেননি তিনি; তাঁর সংকল্পে তবু তিনি অটল ছিলেন।

"প্রেসিডেন্ট কেনেডি নিহত হতে চলেছেন!"

ডালাসের রাজপথে কেনেডি যখন গুলিবিদ্ধ হন, তার মাত্র কুড়ি মিনিট আগে, কালিফর্নিয়ার টেলিফোনে, এক অজ্ঞাত নারীর অস্ফুট সতর্কবাণী হঠাৎ গুঞ্জিত হয়ে উঠেছিল।

কেনেডি অবশ্য সেই সতর্কবাণীর কথা জানতেন না। কিন্তু তিনি জানতেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে এক বীভৎস বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে তোলা হয়েছে। এবং দক্ষিণী অঞ্চলে সেই আগুনের জিহ্বা যে ইতিমধ্যে লেলিহান হয়ে উঠেছে, তাও তিনি জানতেন। কিন্তু- বিদ্বেষের আগুন দেখে তিনি কখনও ভয় পাননি। সমস্ত জেনেও ডালাসের পথে তিনি পা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

"প্রেসিডেন্ট কেনেডি নিহত হতে চলেছেন!"

কালিফর্নিয়ার টেলিফোনে সেদিন কার কণ্ঠ গুঞ্জিত হয়েছিল, কোনদিনই তা হয়ত জানা যাবে না। কিন্তু সেই ভয়ার্ত সতর্কবাণী উচ্চারিত হবার মাত্র কুড়ি মিনিট বাদেই হঠাৎ রাইফেল গর্জে উঠল।

ভালবাসা! বিদ্বেষের উত্তরে যিনি ভালবাসার মন্ত্র শোনাতে গিয়েছিলেন, ডালাসের এক নির্বিবেক আততায়ীর রাইফেল তাঁর মুখের হাসিটিকে সেদিন রক্তে ভাসিয়ে দিয়েছে।

অনেক দিনের অনেক কথাই আজ অনেকের মনে পড়বে।

মনে পড়বে সেই তরুণ ছাত্রের কথা, অর্থের কোনও অভাব যাঁর ছিল না, কিন্তু মহৈশ্বর্যেও যিনি নম্র ছিলেন। মনে পড়বে সেই তরুণ লেফটেন্যান্টের কথা, মাতৃভূমির আহ্বানে যিনি যুদ্ধে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই ভয়ঙ্কর দিনটির কথা মনে পড়বে, সলোমন দ্বীপের কাছে দুটি জাপানী ডেস্ট্রয়ার যেদিন তাঁর পি টি বোটকে ডুবিয়ে দিয়েছিল। কেনেডি সেদিন ভীষণভাবে আহত হয়েছিলেন, কিন্তু আহত অবস্থাতেও অধিনায়কের দায়িত্ব তিনি পরিহার করেননি। সঙ্গীদের দায়িত্ব নিয়ে, প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে ন দিন ধরে সংগ্রাম চালিয়ে, তিনি সেদিন মৃত্যুর সমুদ্র থেকে আবার জীবনের বেলাভূমিতে এসে পৌঁছেছিলেন। মনে পড়বে সেই মানুষটির কথা, দুর্দিনের সঙ্গীদের যিনি ভুলে যাননি: সেই বিপর্যয়ে নিহত সঙ্গীর পরিবারকে যিনি প্রতি মাসেই অর্থ-সাহায্য পাঠাতেন। মনে পড়বে সেই সাংবাদিকের কথা, রিপোর্টার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করবার কিছুকাল বাদেই যিনি পুলিটজার প্রাইজ পেয়েছিলেন। মনে পড়বে সেই বিখ্যাত টেলিভিশন-দ্বন্দ্বের কথা, বাকচাতুর্য আর আর শাণিত যুক্তির সাহায্যে প্রতিদ্বন্দ্বী নিক্সনকে যাতে তিনি পর্যুদস্ত করেছিলেন। মনে পড়বে, তাঁর জয়লাভের সঙ্কল্প ছিল অটল। মনে পড়বে ভারত সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত উক্তির কথা: "ভারতের পথ

শান্তির পথ।" মনে পড়বে কমিউনিস্ট শিবির সম্পর্কে তাঁর সহিষ্ণু সাহসিকতার কথা: "আমরা ভয় পেয়ে আলোচনা করব না বটে, কিন্তু আলোচনা করতেও ভয় পাব না।" মনে পড়বে, যুদ্ধ নয়, শান্তিই ছিল তাঁর লক্ষ্য। আবার একই সঙ্গে মনে পড়বে যে, শান্তি-বাদকে এই মানুষটি কখনও দুর্বলতার নামান্তর বলে মনে করতেন না। আইজেনহাওয়ারের আমেরিকার ঈষৎ ধূসর ছবিটি তাই কেনেডির আমলে আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। মনে পড়বে যে, তরুণ রাষ্ট্রনায়কের দুর্জয় সাহস সত্ত্বেও (অথবা এই দুর্জয় সাহসের মধ্যে যে সরল স্পষ্টতা ছিল, তারই জন্যে) কমিউনিস্ট নায়ক ক্রুশ্চফ তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। মনে পড়বে সেই নির্মল হাসির কথা, শুধুই পত্নী জ্যাকলিন পুত্র জন-জুনিয়র অথবা কন্যা ক্যারোলিনের সান্নিধ্যে নয়, যে-কোনও অবস্থায় যে-কোনও পরিবেশে তাঁর তরুণ মুখচ্ছবিকে যা আরও দীপ্তি দান করত। মনে পড়বে যে, বর্ণের ব্যবধান তিনি স্বীকার করেননি। মনে পড়বে নিগ্রো-সমাজ সম্পর্কে তাঁর বলিষ্ঠ ঔদার্যের কথা। আর মাঝে মাঝেই সেই দুঃসাহসী ঘোষণা অনেকের কানে বাজবে: "যা না-করে আমি পারব না, তা আমি করবই।"

যা না-করে তাঁর উপায় ছিল না, ঠিক তা-ই তিনি করতে গিয়েছিলেন। বিদ্বেষের কানে শুভেচ্ছার বাণী শোনাতে গিয়েছিলেন জন ফিটজেরাল্ড কেনেডি। শোনাতে গিয়ে তিনি আত্মাহুতি দিলেন।

ডালাসের সেই বাড়ির প্রতিটি দরজায় পুলিস-পাহারা বসানো হয়েছিল। কিন্তু পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে তবু বেরিয়ে আসতে পেরেছিল লী হার্ভে অসওয়াল্ড। পুলিস তখন তাকে সন্দেহ করেনি।

সন্দেহ করল পেট্রোলম্যান টিপিটকে হত্যার পরে। ঘণ্টার পর-ঘণ্টা জেরার পরে। প্যারাফিন-টেস্টের পরে। এবং আরও কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করবার পরে।

নিতান্ত সন্দেহ করল বললে অবশ্য ভুল বলা হয়। তার কারণ, ডালাসের পুলিস-চীফ জেস কারি জানালেন, কেনেডি যেদিন গুলিবিদ্ধ হন, সেদিন সকালেই যে অসওয়াল্ড একটি মস্ত বড় পার্সেল নিয়ে (এমন পার্সেল, একটি রাইফেল যার মধ্যে অনায়াসেই এঁটে যেতে পারে) সেই বাড়িটিতে ঢুকেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। শুধু তাই নয়, "কেনেডি যখন গুলিবিদ্ধ হন, ঠিক সেই মুহূর্তেই অসওয়াল্ডকে অনেকে সেই বাড়ির মধ্যে দেখতে পেয়েছিল।" ইতিমধ্যে অসওয়াল্ডের বাড়িতে তল্লাস চালিয়ে কিছু ফোটো এবং অসওয়াল্ডের স্বহস্তে লেখা একটা চিঠি উদ্ধার করা হয়েছে। সেই ফটো আর চিঠি প্রমাণ দিচ্ছে যে, যে রাইফেলের সাহায্যে কেনেডিকে হত্যা করা হয়, অসওয়াল্ডের সঙ্গে তার যোগসূত্র বর্তমান। তার উপরে ছিল প্যারাফিন-টেস্টের নীরব সাক্ষ্য, অসওয়াল্ডের হাতে বারুদের চিহ্ন আবিষ্কারে যা নাকি ব্যর্থ হয়নি। সুতরাং অসওয়াল্ডই যে কেনেডির হত্যাকারী তাতে আর কোনও সন্দেহ ছিল না।

জেস কারি যা আভাসে-ইঙ্গিতে জানাচ্ছিলেন, অন্য একজন পুলিস-অফিসার তা আরও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন। বললেন, আর কোনও সন্দেহ নেই, "দিস ম্যান কিল্‌ড্‌ দি প্রেসিডেন্ট।"

আমেরিকার মানুষ সে-কথা যথাসময়ে শুনেছিল। কিন্তু, টেলি-ভিশনের সামনে বসে, ডালাস পুলিসের হেডকোয়ার্টার্সের ছবি দেখতে দেখতে, আবার চমকে উঠেছিল তারা। টেলিভিশনে তারা দেখছিল, পুলিস হেডকোয়ার্টার্স থেকে অসওয়াল্ডকে কাউন্টি-জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। হাতে হাতকড়া, দু দিকে দুজন সিকিউরিটি অফিসার, সামনে ক্যামেরাম্যান আর রিপোর্টারদের ভিড়। সেই ভিড় ঠেলে একটি মানুষ হঠাৎ সামনে এগিয়ে এল, অসওয়াল্ডের উপরে পিস্তল তুলে ধরল। আর তারপরেই দেখা গেল যে, অসওয়াল্ড লুটিয়ে পড়েছে।

অসওয়াল্ডের হত্যাকারীর নাম জ্যাক রুবি। ডালাসে সে একটি

নাইট-ক্লাবের মালিক। সে বলেছে, জাকলিন কেনেডির প্রতি সহানুভূতিবশতই সে অসওয়াল্ডকে হত্যা করেছে।

প্রশ্ন উঠবে, সত্যিই কি তাই? এই হত্যা কি সত্যিই কেনেডি-পরিবারের জন্যে সহানুভূতির প্রকাশ, নাকি প্রমাণ লোপের চেষ্টা? (ইতিমধ্যে এমন খবর পাওয়া গিয়েছে, যাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, অসওয়াল্ড আর রুবির মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে।) দ্বিতীয় অনুমান যদি সত্য হয়, তবে বুঝতে হবে, কেনেডিকে হত্যা করবার জন্য একটা বড় রকমের ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, আরও অনেকেই যার সঙ্গে জড়িত। অসওয়াল্ডকে তারা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিল। এখন অসওয়াল্ডের মুখ চিরকালের জন্যে বন্ধ করে দিয়ে তারা নিজেদের পরিচয় গোপন করতে চাইছে।

জ্যাক রুবির মতন কুখ্যাত মানুষ যে কী করে, পকেটে পিস্তল নিয়ে, পুলিস হেডকোয়ার্টার্সে ঢুকতে পারে, এবং সিকিউরিটির বেড়া ডিঙিয়ে আসামীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে, সেও এক রহস্য। এই রহস্যকে কেন্দ্র করে কিছু কঠিন প্রশ্ন না-উঠেই পারে না, এবং ডালাস-পুলিসকেই সেই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

ডালাস থেকে ওয়াশিংটন।

হোয়াইট হাউসের একটি কক্ষে এনে রাখা হয়েছে নিহত নায়কের শবাধার। ব্রোঞ্জের সেই শবাধারটি পতাকা দিয়ে আবৃত।

বিমান-বন্দর থেকে প্রেসিডেন্টের মৃতদেহ প্রথমে নৌবাহিনীর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হোয়াইট হাউসে নিয়ে আসা হয়েছে। সঙ্গে ছিলেন জাকলিন। ছিলেন কেনেডির ভাই রবার্ট।

অ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে, রবার্টের কাঁধে ভর দিয়ে, শ্রান্ত পায়ে, স্বামীর শবাধার অনুসরণ করে, জাকলিন এসে হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করলেন।

হোয়াইট হাউস। মার্কিন প্রেসিডেন্টের বাসভবন।

এই হোয়াইট হাউসকে কেন্দ্র করে নির্বাচনী সভায় কেনেডি একদিন যা বলেছিলেন, স্বামীর শবাধারের দিকে তাকিয়ে কি আজ জাকলিনের সে-কথা মনে পড়েছিল?

কেনেডি তখনও প্রেসিডেন্ট হননি। নির্বাচনের প্রাক্কালে তিনি তখন একটার-পর-একটা বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। এমনই একটি সভায় সেদিন তাঁর স্বামীর পাশে বসে ছিলেন জাকলিন। হঠাৎ তাঁকে দেখিয়ে দিয়ে, শ্রোতাদের ঠাট্টা করে, কেনেডি বলে উঠলেন, "সুন্দরী এই মহিলাকে আপনারা দেখুন। দেখে বলুন, হোয়াইট হাউসেই এঁর থাকা উচিত কিনা।"

নির্বাচনে জিতেছিলেন কেনেডি। স্বামীর সঙ্গে জাকলিন এই হোয়াইট হাউসে এসে উঠেছিলেন। ঘরগুলিকে তিনি নতুন করে সাজিয়েছিলেন। কোনও ঘরের রঙ পালটেছিলেন; কোনও ঘরের আসবাব। মিটিংয়ে, কনফারেন্সে, পার্টিতে এই বাড়িটি সবসময় গমগম করত।

কন্যা ক্যারোলিন এখানে হাওয়ার মতন ছুটে বেড়াত। পুত্র জন-জুনিয়র এখানে হাঁটতে শিখেছিল।

একটি মাত্র মানুষের অভাবে সেই আনন্দোচ্ছল বাড়িটি আজ শূন্য হয়ে গিয়েছে।

হোয়াইট হাউস আজ নিস্তব্ধ।

বাইরে জনতার ভিড়। সাদা মানুষ আর কালো মানুষের ভিড়। প্রিয় প্রেসিডেন্টের মৃত্যু-সংবাদ শুনে তারা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর একে-একে তারা হোয়াইট হাউসের সামনে এসে সমবেত হয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে তারা। কিন্তু কেউ কোনও কথা বলছে না। যেন করপুটে এক বিপুল স্তব্ধতাকেই তারা তাদের শেষ-অঞ্জলির মতন তুলে ধরেছে। আর সেই গম্ভীর স্তব্ধতার মধ্যে, নিদ্রাহীন নিশীথিনীর হৃৎপিণ্ডের মতন, ধ্বনিত হচ্ছে নৌ-

সেনাদলের পায়ের শব্দ। ধীর পদক্ষেপে তারা 'গার্ড অব অনার' দিচ্ছে।

ভিতরে, সুবিশাল একটি কক্ষের মধ্যে, ব্রোঞ্জের একটি শবাধারের পাশে তখন বাতি জ্বলছিল।

কী কারণ এই মৃত্যুর? এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের?

তরুণী স্ত্রীর জীবন থেকে তাঁর প্রেমিক স্বামীকে, আনন্দোচ্ছল পুত্রকন্যার জীবন থেকে তাদের স্নেহময় পিতাকে, স্নেহাতুর জনক-জননীর জীবন থেকে তাঁদের বীর সন্তানকে, জনসাধারণের জীবন থেকে তাদের প্রিয়তম নেতাকে কেন ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে?

এ কি কোনও উন্মাদের অন্ধ আক্রোশ? নাকি ক্ষমতা হারাবার আতঙ্কে যারা অস্থির, এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে তাদের চক্রান্ত গত কয়েক মাস ধরেই কাজ করে গিয়েছে? লিঙ্কন, রুজভেল্ট আর কেনেডির মতন আদর্শবাদী মানুষকে যে-আমেরিকা নেতা হিসেবে পেয়েছিল, তার রাজনীতির মধ্যে এখনও এক আদিম অন্ধকার লুকিয়ে আছে নাকি?

বিদ্বেষ ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কেনেডির সঙ্গে একই গাড়িতে ছিলেন টেকসাসের গবর্নর জন কনালি। তিনিও সেদিন গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু প্রাণ হারাননি। হাসপাতালে, রোগশয্যায় শুয়ে, তিনি বলেছেন, আমেরিকার "সমাজজীবনকে চরমপন্থীরা কীভাবে বিষাক্ত করে তুলেছে, বিশ্ববাসী তা আজ নির্ভুলভাবে বুঝতে পারল।"

বিদ্বেষ ছিল। সেই বিদ্বেষের আগুনকে ব্যাপকভাবে জ্বালিয়ে তোলা হয়েছিল।

কেনেডি যেদিন ডালাসে যান, তার মাত্র কিছুকাল আগেই সেখানে অদ্ভুত একটি প্ল্যাকার্ড ছড়ানো হয়েছে। প্ল্যাকার্ডে কেনেডির ছবি। তার নীচে লেখা: "ওয়াণ্টেড ফর ট্রীজন"।

শুধু তাই নয়। কেনেডি যে দিন ডালাসে পৌঁছন, ডালাসের

একটি সংবাদপত্রে সেদিন শোকের কালো বর্ডার দিয়ে একটি পৃষ্ঠা ছাপা হয়েছিল। আর সেই পৃষ্ঠাটিতে, কেনেডির উদ্দেশে রচিত একটি ক্রুদ্ধ চিঠিতে, লেখা হয়েছিল, "সেই শহরে আপনাকে স্বাগত জানাই, ১৯৬০ সনেই আপনার মতবাদ আর নীতিকে যে শহর প্রত্যাখ্যান করেছে, এবং আবারও, আরও জোরের সঙ্গে, যে শহর তাকে প্রত্যাখ্যান করবে।"

বিদ্বেষের আগুন যে বেশ ব্যাপক ভাবেই জ্বলছে, ছাত্রেরাও তা জানত। ডালাসের একটি ছাত্র তার মায়ের কাছে লেখা একটি চিঠিতে জানিয়েছিল, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কেনেডি যদি এখানে আসেন, তবে টেক্সাসেরই কোনও মানুষ তাঁকে হত্যা করবে।"

তার উপরে আবার শোনা গেল যে, প্রেসিডেণ্ট কেনেডি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, এই খবর শুনে ডালাসের একটি ইস্কুলের কিছু ছাত্র নাকি উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠেছিল। শিশুদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। নিজের থেকে তারা কাউকে ঘৃণা করে না; বড়দের কাছ থেকেই তারা ঘৃণার শিক্ষা পায়।

বিদ্বেষ ছিল। ঘৃণা ছিল। সেই ভয়ঙ্কর ঘৃণাকে লেলিহান শিখায় জ্বালিয়ে তুলবার, এবং তাকে কাজে লাগাবার, লোকেরও হয়ত অভাব ছিল না।

কারা তাকে কাজে লাগিয়েছে, আমেরিকা এই প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই খুঁজবে।

আজ তার অনুতাপের দিন। ডালাসের রাজপথের উপরে, কেনেডি যেখানে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন, তার কয়েক ফুট দূরে, ঘাসের উপরে তাই দুটি মালা দেখা গিয়েছিল। মালার সঙ্গে ছিল দুটি কার্ড। একটিতে লেখা: "আমাদের প্রিয় প্রেসিডেণ্ট জন এফ কেনেডির স্মরণে।" অন্যটিতে: "আমরা অনুতপ্ত।"

সমগ্র ডালাসের হয়ে কারা যেন সেদিন নিহত নায়কের কাছে ক্ষমা চেয়ে গিয়েছে।

এখন ক্ষমা প্রার্থনার সময়। এখন অশ্রু বিসর্জনের সময়। নতমুখে এখন বলবার সময়ঃ "ক্রোধে তাকে আমরা হনন করেছি, প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করব।"

অনুতপ্ত আমেরিকা জানে, আর্লিংটনের সমাধিক্ষেত্রে একটি নারী গিয়ে তাঁর স্বামীর সমাধির শিয়রে একটি দীপশিখা জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছেন। মধ্যনিশীথের স্তব্ধ অন্ধকারে সেই সমাধিক্ষেত্রে আবারও দেখা গিয়েছিল সেই নারীকে। স্থির দৃষ্টিতে সেই দীপশিখার দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি, মূঢ় মানুষের জ্বলন্ত ঘৃণার উত্তরে যা শুধুই ভালবাসার স্নিগ্ধ আলো বিকিরণ করবে।

প্রতিটি ছবিই খুবই স্পষ্ট। তবু তারই মধ্য থেকে যেন আর-একটি ছবি ধীরে-ধীরে জেগে উঠেছে। আরও স্পষ্ট, আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সে-ছবি নিপীড়িত মানুষের ছবি। নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখার আনন্দে টালমাটাল হাঁটছে তারা; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণকায় মানুষেরা। কেনেডির আহ্বানে যেমনভাবে এই সেদিন তারা লিঙ্কন-মেমোরিয়ালের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবেই তারা এখন এক নতুন তীর্থের দিকে—জন ফিটজেরাল্ড কেনেডির সমাধিভূমির দিকে—এগিয়ে যাচ্ছে। চিরন্তন দীপশিখার দিকে তাকিয়ে, মিলিত কণ্ঠে বলছে, ও "ক্যাপ্টেন! ডিয়ার ফাদার!"

ভবিষ্যতের ছবি।

তাসের বাড়ি

পিতার দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ভঙ্গি তখনও উদ্ধত। কলিং বেলের বোতাম টিপে জানিয়েছিলেন, তিনি এসেছেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি তখনও কঠিন। পিতৃগৃহের দরজা সেদিন খোলেনি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ত্রান ভ্যান চোয়ুং অবশ্য সেদিন তাঁর ওয়াশিংটনের বাড়িতে ছিলেন না। কিন্তু ওয়াশিংটনে থাকলেও তিনি দরজা খুলতেন কিনা, সেটা ঘোর সন্দেহের বিষয়। তার কারণ, কন্যা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য তিনি আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "অমন মেয়ের আমি মুখ দেখতে চাই না।"

কিন্তু কন্যার মুখ তবু দেখতে হয়েছে তাঁকে। কেননা, চাকা এখন ঘুরে গিয়েছে। মাদাম নু-র কণ্ঠস্বরে অবশ্য সেই দর্পিত ভঙ্গির আভাস এখনও দুর্লক্ষ্য নয়, কিন্তু তাতে আর কেউ ভয় পাচ্ছে না। তাঁর বন্ধুরা এখন নীরব। তাঁর বিরোধীরা এখন হাসছে। কিন্তু, বিরোধী-দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও হাসি নেই তাঁর পিতার মুখে, কোন দিনই ছিল না। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জ্বলন্ত আত্মাহুতির খবর শুনে মাদাম নু যেদিন বলেছিলেন, ওরা পুড়ে মরুক, "আমরা হাততালি দেব"—সেদিনও হাসতে পারেননি ক্যাথলিক-কন্যার ভিন্নধর্মী পিতা ত্রান ভ্যান চোয়ুং। আজও পারছেন না। বৌদ্ধ-বিদ্বেষী দিয়েম-চক্র চূর্ণ হয়েছে, এই খবর শুনে আজ সায়গনের জনতা যখন পথে-পথে আনন্দোৎসবে মত্ত হয়ে উঠেছে, তখনও তাঁর মুখে হাসি নেই। বিরোধী হিসেবে আজ তাঁর জয়ের দিন বটে, কিন্তু পিতা হিসাবে চরমতম দুঃখের। তাঁর জামাতার মৃত্যু হয়েছ; তাঁর কন্যা আজ স্বামিহীনা।

মেয়ের মুখ যিনি দেখতে চাননি, সেই ত্রান ভ্যান চোয়ুংকে তাই সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হয়েছিল। বলতে হয়েছিল, "জামাতা নো দিন নু-র মৃত্যু-সংবাদ যদি সত্য হয়, তবে আমার মেয়ের সঙ্গে আমি নিশ্চয়ই দেখা করব, এবং তার শোকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করব।"

দিয়েম-সরকারের বৌদ্ধ-নিপীড়ন-নীতির প্রধান স্তম্ভ ছিলেন নো দিন নু। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ যে সত্য হবে না, এমন কথা অবশ্য কল্পনা করাও কঠিন। তার কারণ, দিয়েম-সরকা.'র যাঁরা বিরোধী ছিলেন, স্বয়ং দিয়েমের বিরুদ্ধেও তাঁদের ততটা আক্রোশ ছিল না, যতটা আক্রোশ ছিল দিয়েম-সরকারের নেপথ্য-নায়ক এই মানুষটির বিরুদ্ধে। (এবং সেই আক্রোশ মোটেই অকারণ ছিল না।) বস্তুত, এমন কথা এই সেদিন পর্যন্তও অনেকে বলেছেন যে, দিয়েম ত নেহাত খারাপ মানুষ নন, রাজ্যের দুষ্টগ্রহ আসলে তাঁর তৃতীয় ভ্রাতা। এবং তৃতীয় ভ্রাতার পত্নী। অর্থাৎ নো দিন নু আর মাদাম নু। বিদেশী সাংবাদিকরাও সে-কথা জানতেন। ঠাট্টা করে তাঁরা বলতেন, "নো নুজ ইজ গুড নিউজ।"

নু-দম্পতির প্রধান অপরাধ তাঁদের বৌদ্ধ-বিদ্বেষ। সেই বিদ্বেষের আগুনে গোটা দেশকে তাঁরা জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। পাল্টা-মারের মুহূর্ত যখন এল, নু তখন মারা পড়লেন, এবং দিয়েমও তখন রেহাই পেলেন না। মাদাম নু ছিলেন বিদেশে। বড় মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতস্তত দিয়েম-সরকারের নীতির সমর্থনে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। কে জানে, বিদেশে ছিলেন বলেই হয়ত বেঁচে গিয়েছেন তিনি। স্বদেশে থাকলে তাঁকে হয়ত সহমরণে পাঠানো হত।

না, দিয়েম আর নু-র মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে আর কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই। শুধু প্রশ্ন উঠতে পারেঃ এই মৃত্যু আসলে হত্যা, না আত্মহত্যা?

খবর থেকে এই প্রশ্নের কোনও স্পষ্ট উত্তর পাবার উপায় নেই।

দক্ষিণ ভিয়েতনামে সামরিক অভ্যুত্থানের পর প্রথম দিনের খবরে ছিল, "দিয়েম বন্দী (মতান্তরে পলাতক), নু নিহত।" দ্বিতীয় দিনের খবরে ছিল সায়গন-রেডিয়োর ঘোষণা। সায়গন-রেডিয়োর সংবাদ : দুজনেই আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু ওই একই দিনের অন্য-এক সংবাদে প্রকাশ, দিয়েম আর নু প্রাসাদ থেকে পালিয়ে গিয়ে এক গির্জায় আশ্রয় নিয়েছিলেন ; কিন্তু টহলদার একজন সৈনিক সেখানে তাদের সন্ধান পায়, এবং 'ট্রিগার হ্যাপি' সেই সৈনিকটি সেখানে গুলি চালিয়ে তাঁদের হত্যা করে। তারও পরবর্তী একটি খবরে বলা হয়েছে যে, দিয়েমকে গুলি করা হয়েছিল বটে, তবে নু-কে নয়। নু-কে হত্যা করা হয়েছিল ছোরা মেরে।

এর মধ্যে কোনটা যে সত্য খবর, আর কোন্‌টা ঝুটা, বলা কঠিন। তবে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, হত্যার খবরটা সত্য হলেও সেটাকে স্বীকার করে নেওয়া সহজ নয়।

সায়গন-রেডিয়ো বলেছে, আত্মহত্যা। লস্‌ এঞ্জেলসে মাদাম নু বলেছেন, না, "আত্মহত্যা নয়। তাঁদের হত্যা করা হয়েছে। এবং সরকারীভাবেই হক, আর বেসরকারীভাবেই হক, মার্কিন সরকারের এতে সমর্থন ছিল।"

মাদাম নু-র জিহ্বা বড় বেশী রকমের ধারালো। কিন্তু সেই জিহ্বাকে আর এখন কেউ ভয় করে না। তাঁর তাসের প্রাসাদ ভেঙে পড়েছে।

দক্ষিণ-ভিয়েতনাম সরকারের তাসের বাড়ি যাঁরা গুঁড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁদের নেতাকে আজ সবাই চেনেন। জেনারেল ডুয়ং ভ্যান মিন, মাত্র কিছুকাল আগেও ছিলেন প্রেসিডেন্ট দিয়েমের আস্থাভাজন সেনাপতি। বয়স সাতচল্লিশ, প্রায় ছ ফুট দীর্ঘ, চেহারা গোলমাল। সবাই বলে 'বিগ মিন'। ফরাসী বিদ্যালয়ে শিক্ষিত এই মানুষটির জনপ্রিয়তার কথা কারও অজানা নয়। জাপানীদের সঙ্গে লড়েছিলেন

তিনি। ধরা পড়েছিলেন। শাস্তি হিসেবে তাঁর দাঁতগুলিকে তখন উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে, ফরাসীরাও তাঁকে জেলে পাঠায়। কারাগারে যাঁকে তিনি সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলেন, এখন তিনি দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রধানমন্ত্রী। তারপর দেশ স্বাধীন হল, দিয়েম ক্ষমতা পেলেন। সেই সময়ে, অত্যাচারী বিন জুয়েন-বাহিনীকে দমন করার ব্যাপারে 'বিগ মিন'ই ছিলেন তাঁর প্রধান সহায়। কিন্তু পরবর্তী কালে দিয়েমের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ঘটেছে, এবং এককালের এই বন্ধুটির ক্ষমতা কেড়ে নিতে দিয়েম কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেননি। দিয়েমের অপ্রীতিভাজন হওয়ায় 'বিগ মিন' ইদানীং বাহিনী-বিহীন সেনাপতিতে পরিণত হয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁর অধীনে কোনও সৈন্যদল ছিল না।

কিন্তু সৈন্যেরা তাঁকে ভালবাসত। ভালবাসতেন 'বিদেশী বন্ধু'রাও। শেষ পর্যন্ত তাঁরই নেতৃত্বে ঘটল সামরিক অভ্যুত্থান। দেখা গেল, দিয়েম-সরকারের শক্তির বিভিন্ন ঘাঁটিকে লক্ষ্য করে সৈন্যদল, সাঁজোয়া গাড়ি আর ট্যাঙ্ক ছুটে আসছে। তারপর প্রাসাদ। নৌ-বাহিনী আর ছত্রী-বাহিনীর সৈন্যেরা গিয়ে দিয়েমের শেষ আশ্রয়ের উপর আঘাত হানল। সেই সঙ্গে আকাশ থেকে ছোঁ মেরে নেমে এল বিদ্রোহীদের বিমান। তারা যে বাধা পায়নি, তা নয়, কিন্তু সৈন্যদের উন্মত্ত ক্রোধের সামনে সেদিন দিয়েমের প্রতিরোধ প্রায় বালির বাঁধের মতই ভেঙে পড়েছিল। প্রাসাদের উপরে সাদা পতাকা উড়িয়ে, ছদ্মবেশে, গুপ্তপথে পালিয়ে গেলেন দিয়েম আর নু। তার খানিক বাদেই দেখা গেল যে, বিদ্রোহী সৈন্যরা প্রাসাদ লুঠ করছে; কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা। কারও হাতে হুইস্কির বোতল, কারও হাতে অলঙ্কার।

প্রেসিডেন্টের ঘরে প্রেসিডেন্টকে পাওয়া যায়নি। শুধু দেখা গিয়েছিল যে, ইতস্তত কিছু কাগজপত্র ছড়িয়ে পড়ে আছে। আর ডেস্কের উপর পড়ে রয়েছে একটি বই। ফরাসী বই। নাম "Ils

Arrivent।" বাংলায় তার অর্থ দাঁড়ায় "তারা আসছে"। কেউ যদি এর মধ্যে অদৃষ্টের ইঙ্গিত খুঁজে পান, তাঁকে দোষ দেওয়া যাবে না।

সায়গনের বেতার-কেন্দ্রটি তার অনেক আগেই বিদ্রোহীদের দখলে চলে গিয়েছিল। সামরিক অভ্যুত্থানের নায়ক ডুয়ং ভ্যান মিনের বাণী প্রচার করা হয়েছিল সেখান থেকে। ভ্যান মিন বলেছিলেন, বৌদ্ধ আর ছাত্রসমাজের উপরে দিয়েম সরকার যে ভয়াবহ অত্যাচার চালিয়েছেন, তারই উত্তরে এই অভ্যুত্থান। বলেছিলেন, "ন বছর রাজ্যশাসন করেছেন প্রেসিডেণ্ট দিয়েম। এই ন বছরের ইতিহাস দুর্নীতির ইতিহাস। দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনসাধারণ এই ন বছর ধরে যে-শুভদিনের প্রতীক্ষা করেছে, সেই শুভদিন এবারে সমাগত।"

শুভদিনই বটে। জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা প্রায় আশিজনই যেখানে বৌদ্ধ, ধর্মান্ধ ক্যাথলিক শাসকদের হাতে বৌদ্ধরা সেখানে আর নিগৃহীত হবে না। সুবিচার চাইলে, মাদান নু-র মতন দ্বিতীয় কোনও মক্ষিরানী আর বলতে পারবেন না, তারা দেশদ্রোহী। চাকরিতে পদোন্নতির আশায় দক্ষিণ ভিয়েতনামের কোনও বৌদ্ধকে অতঃপর বুদ্ধকে ছেড়ে যীশুর শরণ নিতে হবে না, এবং ধর্মাচরণের স্বাধীনতা অতঃপর অক্ষুণ্ণ থাকবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, (১) দক্ষিণ ভিয়েতনামের বন্দী বৌদ্ধরা মুক্তি পেয়েছেন। (২) প্রধানমন্ত্রীর আসনে যাঁকে বসানো হয়েছে, তিনি বৌদ্ধ।

সবাই জানে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন না থাকলে দিয়েমকে হটাবার চেষ্টা এবারেও সফল হত না। এবারেও হত না; অর্থাৎ এমন চেষ্টা আগেও হয়েছিল।

প্রথম চেষ্টা হয়েছিল ১৯৬০ সনে। বিদ্রোহী ছত্রী-বাহিনীর সৈন্যরা পুরো এক দিনের জন্যে দিয়েমের প্রাসাদকে সেবারে অবরোধ

করেছিল। বুদ্ধিবলে দিয়েম সেবারে রক্ষা পেয়ে যান। আত্মসমর্পণের ইচ্ছা তাঁর ছিল না। কিন্তু, সে-কথা জানতে না-দিয়ে, বিদ্রোহীদের সঙ্গে তিনি আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকেন। আলোচনা শেষ হবার আগেই এসে হাজির হয় তাঁর অনুগত সৈন্যদল; দিয়েমকে তারা রক্ষা করে।

দ্বিতীয়বারের ঘটনা আরও রোমাঞ্চকর। ১৯৫২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের কথা। বিমান বাহিনীর দুজন বিদ্রোহী অফিসার হঠাৎ প্রাসাদের উপরে আকাশী আক্রমণ চালান। প্রাসাদের উপরে তাঁরা বোমা ফেলেছিলেন, কামান চালিয়েছিলেন। কিন্তু সেবারেও রক্ষা পেয়ে যান দিয়েম। তবে, বুদ্ধিবলে নয়, নেহাতই ভাগ্যবলে।

কথায় বলে বার বার তিনবার। তৃতীয়বারে তিনি রক্ষা পাননি।

কিন্তু রক্ষা পাওয়া যে অসম্ভব হবে, দিয়েম কি সে-কথা আগেই বুঝতে পেরেছিলেন নাকি? না-ই যদি বুঝবেন, তাহলে, মাত্র দু-মাস আগে, সাংবাদিকদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করতে-করতে, তিনি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন কেন? সত্যিই সেই সাংবাদিক-সম্মেলনে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, "অনুন্নত দেশগুলিতে সামরিক অভ্যুত্থানকে এখন একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হিসেবেই আমাদের গ্রহণ করা উচিত। বার্মা, কোরিয়া, থাইল্যাণ্ড, আফ্রিকা, ভিয়েতনাম—এসব দেশের অবস্থা এখন আগ্নেয়গিরির মতন। যে-কোনও মুহূর্তে এরা অগ্নি উদ্‌গিরণ করতে পারে। সেই আগুনকে যদি হজম করতে হয়, তাহলে পরিপাক-যন্ত্রটা বেশ সবল হওয়া দরকার।"

দু দু-বার আগুন হজম করেছিলেন দিয়েম। তৃতীয়বারে তিনি ব্যর্থ হলেন।

মাদাম নু বলছেন, ব্যাপারটার পিছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাত ছিল। যুক্তরাষ্ট্র সে-কথা স্বীকার করছে না। কিন্তু শুধু মাদাম নু

কেন, কথাটা আরও অনেকে বলছে। তাঁর প্রাসাদ যখন আক্রান্ত হয়, তখন দিয়েমের চিত্তেও এই একই সন্দেহ উঁকি দিয়ে গিয়েছিল। নিউ ইয়র্কের ডেলি নিউজ পত্রিকার সায়গন-করেসপণ্ডেণ্ট যোসেফ ফ্রায়েড যে খবর পাঠিয়েছেন, তাতে অন্তত সেই রকমই মনে হয়। ফ্রায়েড বলছেন, প্রাসাদ থেকেই মার্কিন রাষ্ট্রদূত হেনরি ক্যাবট লজকে ফোন করেছিলেন দিয়েম; জিজ্ঞেস করেছিলেন, এ-ব্যাপারে আমেরিকা কাকে সমর্থন করে।

লজ সে-কথার স্পষ্ট জবাব দেননি। বলেছিলেন, সায়গনে বসে তাঁর পক্ষে এ সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, "আপনার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা আমি ভাবছি। এ-ব্যাপারে আমার কিছু করবার আছে কিনা, বলুন।"

দিয়েম সবই বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু লজের সাহায্য তিনি নেননি। বলেছিলেন, কারও সাহায্য তিনি চান না, শেষ পর্যন্ত তিনি বিদ্রোহীদের বাধা দেবেন।

লজের সঙ্গে আরও একবার কথা হয়েছিল দিয়েমের। টেলিফোনেই। লজ জানিয়েছিলেন, বিদ্রোহী সৈন্যরা ঘোষণা করেছে যে, দিয়েমকে তারা নিরাপদে দেশত্যাগের সুযোগ দেবে।

খুবই স্পষ্ট ইঙ্গিত। কিন্তু দিয়েমের সপক্ষে অন্তত এই একটা কথা তাঁর শত্রুরাও নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে, এবারেও এই ইঙ্গিতের সুযোগ তিনি নেননি। লজের কথার জবাব দেননি তিনি। রিসিভারটাকে তিনি ক্রেড্‌ল-এর উপরে নামিয়ে রেখেছিলেন।

পরবর্তী ঘটনাগুলির কথা কারও অজানা নেই। প্রাসাদ থেকে তিনি সভ্রাতা পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পালিয়ে গিয়েও তিনি রক্ষা পাননি।

উপমাটা নিষ্ঠুর। তবু না-বলে উপায় নেই যে, দিয়েমের প্রসঙ্গে আজ হয়ত অনেকের নিরোর কথা মনে পড়বে। শাসনকালের

সূচনাপর্বে নিরো (এমন কী, নিরোও) নেহাত কম সুনাম অর্জন করেননি। সুনাম ছিল দিয়েমেরও। শুধুই মুক্তিসংগ্রামের একজন শ্রেষ্ঠ সৈনিক হিসেবে নয়, জাতীয় জীবনের সংগঠক হিসেবেও তিনি স্বদেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু, যেমন নিরো, তেমনি দিয়েমও সেই প্রাথমিক সুনামের সুযোগ হেলায় নষ্ট করেছেন। রোমের সম্রাট ক্রমে-ক্রমে অমানুষ হয়ে উঠেছিলেন। দিয়েম হয়ে উঠেছিলেন দুর্নীতিপরায়ণ। জনজীবনের সঙ্গে তাঁদের একজনেরও তখন যোগ ছিল না, এবং দেয়ালের লিখনকে তাঁদের একজনও তখন পড়ে উঠতে পারেননি।

উপমাকে আর-একটু এগিয়ে নেওয়া যায়। দাউদাউ আগুনে রোম যখন পুড়ছে, নিরো তখন বেহালা বাজিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে, দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিভিন্ন শহরে, প্রকাশ্য রাজপথের উপরে, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের শরীরে যখন দাউদাউ আগুন জ্বলেছে, দিয়েম তখন বেহালা বাজাননি বটে, কিন্তু তাঁরই পরিবারের এক কুখ্যাত মহিলা তখন ব্যঙ্গভরে বলেছিলেন, ওরা পুড়ুক, "আমরা হাততালি দেব।"

একজন অত্যাচারী, অন্যজন দুর্নীতিপরায়ণ। একজন নিষ্ঠুর, অন্যজন নির্বিকার। একজন অমানুষ, অন্যজন ধর্মান্ধ। কিন্তু দুজনের পরিণামই এক। ইতিহাসের চাকা তাঁদের দুজনের জীবনকেই গুঁড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে। নিরো আর দিয়েম—সাদৃশ্য কি এই মানুষ দুটির অন্ত্য জীবনেও খুঁজে পাওয়া যাবে না?

প্রসঙ্গত, দক্ষিণ ভিয়েতনামে যে-সব মার্কিন সাংবাদিক ছিলেন, তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কে দু-একটা কথা এখানে বলা দরকার। দিয়েম-সরকারকে তাঁদের অনেকেই বিশেষ সুনজরে দেখতে পারেননি। দেখা সম্ভব ছিল না। তার কারণ, তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই দুর্নীতিপরায়ণ অত্যাচারী সরকারের পিছনে জনসাধারণের কোনও সমর্থন নেই। এবং জনসাধারণের সমর্থন

যে-সরকার হারিয়েছে, কমিউনিস্টদের অগ্রগতি রোধ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

কথাটা তাঁরা গোপন করেননি। স্বদেশের কাগজে খবর পাঠাবার সময় এই অপ্রিয় সত্য তাঁরা, অনেক দিন থেকেই, বেশ স্পষ্ট করে জানিয়ে এসেছেন। কিন্তু মুশকিল এই যে, সত্য যখন অপ্রিয় হয়, তখন অনেকেই তা পছন্দ করে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক মহল অন্তত করেনি। দিয়েম তখন তাঁদের চোখের মণি। তাঁর নিন্দাবাদে কান না-দিয়ে তাঁরা তাই ভাবছিলেন যে, সায়গনে গিয়ে বিদেশী সাংবাদিকরা হয়ত একটা অশুভ চক্র গড়ে তুলেছেন। তিলকে তাল করাই তাঁদের কাজ। এই রকমের অভিযোগ তুলে আমেরিকার একটি পত্রিকায় কিছু মন্তব্যও করা হল। অত্যুক্তির অভিযোগ ঠিক কার বিরুদ্ধে, স্পষ্ট করে তা বলা হল না বটে, কিন্তু অনেকেই অনুমান করলেন যে, 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্'-এর হলবারস্টামই এক্ষেত্রে আপত্তির প্রধান লক্ষ্য। শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন হল্‌বারস্টাম। বলেছিলেন, "কিসের অত্যুক্তি? কী সম্পর্কে? যা-কিছু আমরা লিখেছি, পরে ত প্রমাণিত হয়েছে যে, তার সবই সত্যি।" (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অভ্যুত্থান যে আসন্ন, হলবারস্টাম তা নাকি আগেই জানতে পেরেছিলেন। বিদ্রোহের আগের রাত্রে তিনি একটি চিরকুট পান। তাতে লেখা ছিল, "আমার জন্যে এক বোতল হুইস্কি কিনবেন।" এটা আর কিছুই নয়, সঙ্কেতবাক্য। অর্থঃ এবারে বিদ্রোহ ঘটতে পারে।)

ক্ষুব্ধ হয়েছিলেম 'টাইম' পত্রিকার চার্লস্ মর্‌ও। বলেছিলেন, যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তা "কন্‌কক্‌টেড এনটায়ারলি ইন নিউ ইয়র্ক"। আর অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের ম্যালকম ব্রাউন বলেছিলেন, "পৃথিবী আসলে দুটি দলে বিভক্ত। এক দল খবর ছাপে, অন্যদল চাপে।"

সায়গনে যে-সব বিদেশী সাংবাদিক ছিলেন, স্বীকার করা ভাল

যে, তাঁরা খবর চাপেননি। যুক্তরাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিরা যে দিয়েমের অনুরাগী, সে-কথা জেনেও তাঁরা কোদালকে কোদাল বলেছিলেন। জানিয়েছিলেন, দিয়েমের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অশ্রদ্ধা দিনে-দিনে বাড়ছে বই কমছে না, এবং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অবস্থাও বিশেষ সুবিধের নয়।

আমেরিকায় অতঃপর প্রশ্ন উঠেছিল, ক্যাড্ দি ইউ এস "উইন উইথ দিয়েম?" নাকি মার্কিন তহবিল থেকে দক্ষিণ ভিয়েতনামে যে টাকা জলের মত ঢালা হয়, তা শেষ পর্যন্ত জলেই যাচ্ছে? (টাকার অঙ্কটা সামান্য নয়। প্রত্যহ প্রায় পনর লক্ষ ডলার।) যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা-সচিব ম্যাকনামারার ভিয়েতনাম-সফরকে এই প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা যেতে পারে। তিনি এবং জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেলর এসে যুদ্ধের হালচাল স্বচক্ষে দেখলেন; দেখে স্বদেশে ফিরে গেলেন। প্রেসিডেন্ট কেনেডি প্রায় একই সময়ে একটি বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। টেলিভিশন-ব্রডকাস্টে তিনি বলেছিলেন যে, দিয়েম সরকার "হ্যাজ গট্ন্ আউট অব টাচ্ উইথ দি পীপ্ল।"

যোগসূত্র কল্পনার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। শুধু পরপর কয়েকটি তথ্য এখানে পরিবেশন করা যাক। জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেলরের ইতিমধ্যে ভারত ও পাকিস্তান সফরের কথা ছিল। কিন্তু, প্রায় শেষ মুহূর্তে, তাঁর সফর বাতিল করে দেওয়া হয়। তার কয়েকদিন পরেই দক্ষিণ ভিয়েতনামে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। ওয়াশিংটনে যখন প্রেসিডেন্ট কেনেডির ঘুম ভাঙিয়ে সেই খবর দেওয়া হয়, রাত তখন তিনটে। খবর পাবার পরে প্রেসিডেন্ট কেনেডি যাঁদের সঙ্গে 'জরুরী বৈঠকে' মিলিত হয়েছিলেন, জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেলর তাঁদের অন্যতম। দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী পরিষদ ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন যে, কমিউনিজমের বিরুদ্ধে তাঁরা সংগ্রাম করবেন।

সংগ্রাম কি দিয়েম-সরকার করছিলেন না? করছিলেন, কিন্তু আমেরিকার ক্ষতির পরিমাণ ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গত অক্টোবর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যে ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে, ইতিপূর্বে আর কোনও মাসেই তত ক্ষতি স্বীকার করতে হয়নি। তা ছাড়া, সামরিক অভ্যুত্থানের যাঁরা নেতা, ইতিমধ্যে তাঁরা নাকি খবর পেয়েছিলেন যে, কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার বদলে, প্রেসিডেন্ট দিয়েম এবং তাঁর ভ্রাতা কমিউনিস্ট উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে একটা রফা করবার চেষ্টায় আছেন।

দিয়েম-সরকারের তাসের প্রাসাদ অতঃপর ভেঙে পড়ল।

উপসংহারে বলি, এশিয়ায় সম্প্রতি যে-কটি ক্যু ঘটেছে, তার প্রায় প্রত্যেকটিই ঘটেছে শুক্রবারে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে গত পয়লা নবেম্বর তারিখে।

এবং সেদিনও ছিল শুক্রবার।

হিউম, সুইট হিউম

হ্যারল্ড ম্যাকমিলান জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি অসুস্থ, প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব-ভার বহন করা আর তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। আর এই ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বদলে গিয়েছিল ব্ল্যাকপূল সম্মেলনের চেহারা। অন্যান্য প্রশ্নকে ডুবিয়ে দিয়ে মাত্র একটি প্রশ্নই সেখানে প্রবল হয়ে উঠেছিল। পার্লামেণ্টে রক্ষণশীল দলের নেতৃত্ব এবারে কার হাতে যাবে?

অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী হবেন কে?

ম্যাকমিলানের পরে কে? মডলিং, না হীথ? হেলশাম, না বাটলার? দলের মধ্যে কার প্রভাব কতখানি, তা নিয়ে যেমন সেদিন বিস্তর গবেষণা হয়েছিল, ঠিক তেমনি ব্ল্যাকপূলে, রক্ষণশীল দলের বার্ষিক সম্মেলনে, এঁদের মধ্যে কে কতটা দাগ কাটতে পেরেছেন, মঞ্চের উপরে কে এসে দাঁড়াবার পর শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে কতখানি উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে, এবং কার বক্তৃতায় কতবার আর কতক্ষণের জন্যে হাততালি পড়েছে, তা নিয়েও সেদিন গবেষণার অন্ত ছিল না।

"অল্পবয়সী টোরি এম-পিরা মডলিংয়ের ভক্ত।" "বিলক্ষণ, কিন্তু মডলিংয়ের বয়স বড় কম, মাত্র ছেচল্লিশ। এত অল্পবয়সী মানুষকে কি প্রধানমন্ত্রী করা ঠিক হবে?" "এদিকে হীথের প্রভাবও নেহাত অল্প নয়।" "তা হয়ত নয়, কিন্তু হেলশামের বক্তৃতার পরে হাততালির ঝড় বয়ে গিয়েছিল।" "ঠিক কথা, কিন্তু শুনতে পাচ্ছি যে, বাটলারই এবারে নেতা হবেন।" "অসম্ভব। বাটলার যদি নেতা হতেন ত ইডেনের পরেই হতেন। তা সেবারে যখন তিনি নেতা হতে পারেননি, তখন এবারেও পারবেন না।"

ম্যাকমিলানের পরে কে? মডলিং, না হীথ? হেলশাম, না বাটলার?

প্রথমে ছিল চারটি নাম। তার মধ্যে প্রথম দুটি নাম, দেখতে না-দেখতে, খসে পড়ল।

রইল বাকি দুই। বাটলার আর হেলশাম।

আশ্চর্য, হিউমের নাম সেদিন কারও মনে পড়েনি। কিংবা, মনে হয়ত পড়েছিল, কিন্তু হিউম যে সত্যিই প্রধানমন্ত্রী হবেন, তা কেউ ভাবতে পারেনি।

ভাবা শক্ত ছিল। তার কারণ, রক্ষণশীল দলের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে একে ত তাঁর প্রভাব সামান্য, তার উপরে অলিখিত এই নিয়মটিকে সবাই মান্য করে চলে যে, ব্রিটেনের যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন, তাঁর কমন্স-সভার সদস্য হওয়া চাই। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, লর্ড হেলশাম ইতিপূর্বেই ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর লর্ড-উপাধি তিনি বর্জন করবেন।) কিন্তু এ দুটি বিঘ্ন সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী হতে হিউমের অসুবিধে হয়নি। স্বয়ং ম্যাকমিলান তাঁর সহায় ছিলেন। পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রানীর কাছে লর্ড হিউমের নাম পেশ করেছিলেন তিনি।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল সবাই। ইভ্নিং স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় মন্তব্য করা হল, "অ্যাস্টনিশিং!" শ্রমিক দলের নেতা হ্যারল্ড উইলসন বললেন, "অ্যান এলিগ্যাণ্ট অ্যানাক্রনিজম্।" সহকারী নেতা জর্জ ব্রাউন বললেন, "দি ব্লাডিয়েস্ট পিস অব মেলোড্রামা।" বলা বাহুল্য, হিউম প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় রক্ষণশীল দলেরও একটা বিরাট অংশ অখুশী হয়েছে। খুশী হয়েছেন সেলুইন লয়েড। একদিন তিনি ব্রিটেনের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী ছিলেন, এবং তাঁকে সরিয়ে দিয়ে ম্যাকমিলান এই হিউমকেই দিয়েছিলেন পররাষ্ট্র-মন্ত্রীর আসন। কিন্তু লয়েডের তা নিয়ে আক্ষেপ নেই। তিনি বলেছেন, হিউম "অতি চমৎকার প্রধানমন্ত্রী হবেন।"

কেউ খুশী হয়েছেন। কেউ অখুশী। কেউ তুষ্ট। কেউ রুষ্ট। কিন্তু বিস্মিত হয়েছেন প্রায় সকলেই। বিস্মিত হতেন না, যদি মনে রাখতেন যে, রক্ষণশীল দলের নেতৃ-নির্বাচন-পদ্ধতিটাই একটু অন্য রকমের। তাতে দলের সাধারণ সদস্যদের মতামত ততটা প্রতিফলিত হয় না, যতটা প্রতিফলিত হয় কর্তাব্যক্তিদের অভিরুচি। অর্থাৎ, ম্যাকমিলানের পরে কে, এই প্রশ্নের উত্তর যে অনেকাংশে স্বয়ং ম্যাকমিলানের উপরেই নির্ভর করবে, তা তাঁদের খেয়াল ছিল না। আর তাই ম্যাকমিলানের সহায়তায় হিউম প্রধানমন্ত্রী হবার পরে ঠাট্টা করে অনেকে এখন বলছেন, "ম্যাকমিলানের পরে ম্যাকমিলান।"

নেতৃনির্বাচনের ব্যাপারে কি তাই বলে দলের মতামত জানবার কোনও চেষ্টাই করা হয়নি? এমন কথা কেমন করে বলি? রানীর কাছে নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম পেশ করবার আগে নিশ্চিন্ত হবার প্রয়োজন ছিল যে, নতুন নেতার পক্ষে নতুন মন্ত্রিসভা গড়া অসম্ভব হবে না। তাই, দলের মতামত জানবার চেষ্টা অবশ্যই হয়েছিল। দেখা গিয়েছিল, হেলশাম আর বাটলার, এই দুজনের পাল্লাই প্রায় সমান ভারী। কিন্তু দলের যাঁরা কর্তাব্যক্তি, এ দুয়ের কারও উপরেই তাঁরা বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। হেলশাম সম্পর্কে আপত্তি ছিল ক্যাবিনেটের ভিতরেই। তাঁর ব্যক্তিত্বের উপরে ক্যাবিনেটের যতটা আস্থা ছিল, বিচারবুদ্ধির উপরে ততটা নয়। এদিকে বাটলারের সম্পর্কে আপত্তি উঠেছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব নিয়ে। প্রশ্ন উঠেছিল, যাঁর ব্যক্তিত্বের দীপ্তি এত কম, দলকে তিনি একসূত্রে বেঁধে রাখতে পারবেন কিনা। প্রশ্নটা হয়ত উঠত না, কট্টর টোরিরা যদি সুয়েজের অপমানকে ভুলে যেতে পারতেন। তা তাঁরা ভোলেননি। তাঁরা মনে রেখেছেন যে, সুয়েজ-অভিযানে এই মানুষটির মোটেই সমর্থন ছিল না। তা যদি থাকত, ইডেন বিদায় নেবার পরে বাটলারই তাহলে হয়ত ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হতেন। কিন্তু বাটলার সেদিন প্রধানমন্ত্রী

হননি। ইডেনের আমলে যিনি ডেপুটি ছিলেন, ইডেনের পরেও তিনি ডেপুটিই রয়ে গেলেন। এবং ম্যাকমিলান বিদায় নেবার পরেও তাঁর রাহুমুক্তি হল না। কট্টর টোরিরা এই মানুষটিকে আজও ক্ষমা করতে পারেননি।

কিন্তু হেলশাম আর বাটলারকে দাবিয়ে রাখা যে খুব সহজ হয়েছিল, তা নয়। দাবিয়ে রাখার জন্য কিছু কৌশল খাটাতে হয়েছিল। নির্বাচকদের বলা হয়েছিল, নেতা হিসেবে কাকে তাঁরা চান, শুধু সেইটে জানলেই চলবে না, তাঁর বিকল্পে কাকে পেলে তাঁরা খুশী হবেন, তাও জানাতে হবে। তার ফল দাঁড়াল এই যে, হেলশামকে যাঁরা নেতা হিসেবে চাইলেন, বাটলারকে তাঁরা চাইলেন না। আবার বাটলারকে যাঁরা নেতা হিসেবে চাইলেন, হেলশামকে তাঁরা চাইলেন না। অথচ, বিকল্প-নেতা হিসেবে এই দুই উপদলেরই বিস্তর লোক চাইলেন হিউমকে। তখন দেখা গেল, নাম্বার-টুর পাল্লাই দুই পয়লা-নম্বর নেতার চাইতে ভারী হয়ে উঠেছে। ম্যাকমিলান ঠিক এইটেই চাইছিলেন।

মজা এই যে, ম্যাকমিলানের এই ইচ্ছের কথাটা যথাসময়ে কেউ জানতে পারেনি। জানতে পারলে, বাটলারকে পথ ছেড়ে দিয়ে, হেলশাম হয়ত সরে দাঁড়াতেন। কিংবা, হেলশামকে পথ ছেড়ে দিয়ে, বাটলার। হিউমকে সেক্ষেত্রে হেলশাম কিংবা বাটলারের সঙ্গে সম্মুখ-সমরে নামতে হত, এবং সেই সমরের ফলাফল হয়ত হিউমের পক্ষে মোটেই শুভ হত না। ম্যাকমিলান আর চার্চিল-পরিবার লর্ড হিউমের পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও হেলশাম আর বাটলারের বিরোধকে তাই বেশ কায়দা করে শেষপর্যন্ত জিইয়ে রাখা হয়েছিল। এমন কী, ম্যাকমিলান এর জামাতা বিমান-মন্ত্রী জুলিয়ান আমেরি নাকি জনাকয়েক টোরি এম-পিকে ফোন করে জানিয়েছিলেন যে, নেতা হিসেবে তাঁর শ্বশুর-মশায় হেলশামকেই চান। কথাটা ম্যাকমিলানের কানে উঠেছিল, কিন্তু তিনি প্রতিবাদ করেননি। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে তিনি

বলেছিলেন, জুলিয়ান বড্ড 'নটি'। অন্যেরা তার অন্য রকমের অর্থ করল। ভাবল, জুলিয়ান আমেরির কথাটা তাহলে মিথ্যে নয়।

হেলশাম অতএব রণাঙ্গনে রইলেন। রইলেন বাটলারও। এবং, এই দুই মহারথীর পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগে, রক্ষণশীল দলের নেতা হিসেবে, হিউমকে ক্ষমতার আসনে বসিয়ে দিতে বিশেষ অসুবিধে হল না। ম্যাকমিলান ছিলেন হাসপাতালে। রানী গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। ম্যাকমিলান তাঁর কাছে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীর নাম পেশ করলেন। আলেকজাণ্ডার ফ্রেডারিক ডগলাস-হিউম, আর্ল অব হিউম, ব্যারন হিউম, ব্যারন ডানগ্ল্যাস অ্যাণ্ড ব্যারন ডগলাস।

শুনে কেঁদে ফেলেছিলেন বাটলারের স্ত্রী। বলেছিলেন, তাঁর স্বামী ত নেহাত পাথরের মানুষ নন। স্পর্শকাতর, রক্ত-মাংসের মানুষ তিনি। পৃথিবীতে তিনি সবচাইতে ভাল প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন।"

প্রসঙ্গত বলি, হিউম প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় অনেকে খুব ক্ষুব্ধ হয়েছেন বটে, কিন্তু ব্রিটেনের দর্জিরা খুব খুশী। তার কারণ, পোশাকের ব্যাপারে হিউম আদৌ উদাসীন নন। তাঁর ট্রাউজার্স আর জ্যাকেটের ছাঁটকাট অতি চমৎকার। বিলিতী দর্জিপাড়ার মুখপত্র "টেলর অ্যাণ্ড কাটার"-এ তাই মন্তব্য করা হয়েছে যে, "ব্রিটেন এবারে এমন একজন প্রধানমন্ত্রী পেয়েছে, যাঁর পোশাকটা অন্তত প্রধানমন্ত্রীর মতন।"

ম্যাকমিলানের আদি-নিবাস স্কটল্যাণ্ডে। লর্ড হিউমও খাঁটি স্কট। তাঁর পৈতৃক নিবাস স্কটল্যাণ্ডের কোল্ডস্ট্রীম গ্রামে। সেখানে তাঁরা অনেককালের জমিদার। আজ থেকে সাতশ বছর আগে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, স্কটল্যাণ্ডের রাজা উইলিয়ম দি লায়ন তাঁদের বিস্তর ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন। বৈবাহিক এবং অন্যান্য সূত্রে সেই সম্পদ কালক্রমে বেড়েছে বই কমেনি। বৈবাহিক সূত্রেই ডগলাস-বংশের সঙ্গে তাঁদের মিলন হয়; উত্তরপুরুষদের উপাধি

রূপান্তরিত হয় ডগলাস-হিউমে। যেমন হিউম, তেমনি ডগলাস-বংশের জমিদাররাও এককালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিস্তর লড়েছেন। শেক্‌সপীয়রের 'হেনরি দি ফোর্থ' নাটকে চতুর্থ আর্ল অব ডগলাসের সম্পর্কে যে একটি উক্তি আছে, সেটি এখানে উল্লেখযোগ্য ঃ

"that sprightly Scot of Scots that runs o'horse-back up a hill perpendicular."

উক্তিটি আর কারও নয়, অমর বিদূষক ফলস্টাফের।

হিউম-বংশের দাপটও নেহাত কম ছিল না। তার উপরে আবার শোনা যায় যে, নিরীহ প্রজাদের উপরে নিদারুণ অত্যাচার চালিয়ে তাঁদের কেউ কেউ অনেক সময় যুদ্ধের নেশা মিটিয়ে নিতেন। একজনের কথা বলি। নেমন্তন্ন করে প্রতিবেশীদের তিনি বাড়িতে ডেকে আনতেন, তারপর পেট পুরে তাদের খাওয়াতেন। আহারের পর পানপর্ব। পানপর্ব সমাপ্ত হবার পর দেখা যেত, নিমন্ত্রিতরা সবাই বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন। আর নিমন্ত্রণকর্তা নাকি সেই সুযোগে গিয়ে তাঁদের সম্পত্তি দখল করে নিতেন। শুধু তাই নয়, মদ্যপান করে তাঁর বাড়িতে যারা বেহুঁশ হয়ে পড়ত, তাদের ফাঁসিতে লটকাতেও নাকি তাঁর কিছুমাত্র কুণ্ঠা হত না। গাছের ডালে তাদের ঝুলিয়ে দিতেন তিনি। অন্য কোনও কারণে নয়, "অতিরিক্ত প্রশ্রয়ের পরিণাম যে কী ভয়ঙ্কর" নিজেকে সেইটে বুঝিয়ে দেবার জন্য।

কিন্তু হাওয়া তারপর পাল্টে গিয়েছে। এবং প্রাচীন, বনেদী, অত্যাচারী সেই জমিদার-বংশের এক উত্তরপুরুষ আজ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হয়ে ভাবছেন, নিজেকে কী করে জনসাধারণের শামিল করা যায়। তার জন্যে তাঁকে লর্ডস সভা থেকে এখন কমন্স সভায় আসতে হবে। লর্ডস সভাকে ঠাট্টা করে সবাই বলে "আদার প্লেস", অন্য ভূমি। সেখানকার শেষ প্রধানমন্ত্রী লর্ড সলস্‌বেরি। ১৮৯৫ সনে তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করবার পর থেকে এই অলিখিত নিয়ম চালু হয়েছে যে, লর্ডস সভার কোনও সদস্যের নেতৃত্বে আর কখনও ব্রিটিশ

মন্ত্রিসভা গঠিত হবে না। গণতান্ত্রিক ব্রিটেনের যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন, জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাঁকে সামনা-সামনি প্রশ্ন করতে পারবেন না, এটা কোন কাজের কথা নয়। অতএব? অতএব "হি কাণ্ট্ সীট ইন দি আদার প্লেস।" তাঁকে কমন্স সভার সদস্য হতে হবে। ১৯২৩ সনে একবার কথা হয়েছিল যে, লর্ড কার্জন প্রধানমন্ত্রী হবেন। কিন্তু নিতান্ত লর্ড বলেই তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন নি। তাঁর বদলে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন বল্ডুইন। ১৯৪০ সনেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। নিতান্ত লর্ড বলেই হ্যালিফাক্স সেবারে চার্চিলের কাছে হার মেনেছিলেন। হিউমকে সেক্ষেত্রে হার মানতে হল না। তার কারণ, নতুন আইনের সুবিধে পেয়েছেন তিনি। তাতে বলা হয়েছে, যদি কারও ইচ্ছে হয়, তা হলে লর্ড উপাধি তিনি বর্জন করতে পারেন। উপাধির মায়া বর্জন করে হিউম অতএব প্রধানমন্ত্রীর আসনে গিয়ে বসতে পেরেছেন।

বাল্যে তিনি ইটনের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু ছাত্র হিসাবে যে খুব চৌখস ছিলেন, এমন কথা কেউ বলে না। বিখ্যাত লেখক সিরিল কনোলি ছিলেন তাঁর সহপাঠী। কনোলির লেখায় অ্যালেক হিউমের উল্লেখ আছে। তিনি বলেছেন, অ্যালেক ছিলেন, "সুকুমার, স্থির, একটু-বা ঘুমন্ত প্রকৃতির ছেলে। এমন ছেলে, যাকে সবাই প্রশংসা করে, চেষ্টা না-করেও যে কিনা খুব সহজেই সকলের—মাস্টারমশাই আর সহপাঠীদের—ভালবাসা পেয়ে যায়। অ্যালেক যদি অষ্টাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করত, তিরিশে পৌঁছবার আগেই সে তা হলে প্রধানমন্ত্রী হত। কিন্তু একালের জীবন-সংগ্রামের সে যোগ্য নয়।"

চরিত্র-বিচারে যে মানুষের কত ভুল হয়, কনোলির এই লেখাটিই তার প্রমাণ। লর্ড হিউম অষ্টাদশ শতকে জন্মগ্রহণ করেননি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর আসনে তিনি ঠিকই বসেছেন। এবং একালের জীবন-

সংগ্রামের তিনি যোগ্য নন, এমন কথাও আর তাঁর সম্পর্কে এখন বলা যায় না।

আসল কথাটা সম্ভবত এই যে, তাঁর ওই ধীরস্থির, ঘুমন্ত ভাবটা একটা ছদ্মবেশ মাত্র। লর্ড হিউমের অনুজ, নাট্যকার উইলিয়ম ডগলাস হিউম, অন্তত সেই কথাই বলেন। তাঁর ধারণা, দাদাকে "যতটা নরম বলে মনে হয়, ঠিক ততটা নরম তিনি নন।"

রাজনীতিতে ঢুকেছিলেন সাতাশ বছর আগে। আজ তিনি প্রধানমন্ত্রী; ১৯৩৭ সনে তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রার পার্লামেণ্টারি প্রাইভেট সেক্রেটারি; এবং সেই প্রধানমন্ত্রীর নাম নেভিল চেম্বারলেন। তারপর একটু একটু করে তাঁকে সামনে এগোতে হয়েছে। অগ্রগতি আরও দ্রুত হত, উচ্চাশা যদি আরও প্রবল হত। কিন্তু হিউমের উচ্চাশা নাকি কোনও দিনই বিশেষ প্রবল ছিল না। এই নিয়ে তিনি নিজেই একটা গল্প বলে থাকেন। প্রথম যেদিন তিনি মদ্যপান করেন, পানের মত্রাটা সেদিন নাকি—প্রথম দিনের পক্ষে—একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল। দেখে তাঁর বাবা তাঁকে একটা উপদেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "কখন থামতে হবে, সেইটে জানাই হচ্ছে জীবনের সব চাইতে জরুরী ব্যাপার।"

রাজনীতির ক্ষেত্রেও এই উপদেশটাকে মনে রেখেছেন অ্যালেক। যেমন এগিয়েছেন, তেমনি থেমেও থেকেছেন। আকাঙ্ক্ষা দমন করেছেন, লোভে কম্পমান হননি। এমন কী, ব্ল্যাকপূলের সেই সম্মেলনে, রক্ষণশীল দলের নেতৃপদ লাভের আশায়, পার্টির সব চাঁইরা যখন অস্থির হয়ে উঠেছিলেন, তখনও হিউম ধীরস্থির, শান্ত। একজন রিপোর্টার তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, "ব্যাপার কী? আর্নট য়ু ক্যাচিং দি ফীভার?" পররাষ্ট্র-মন্ত্রী হিউম তার উত্তরে মৃদু হেসে বলেছিলেন, "আমার কপালে হাত দিয়ে দেখুন; কপাল ঠাণ্ডা। নাড়ি টিপে দেখুন; নাড়ির গতি স্বাভাবিক।"

লোভের জ্বরে যাঁরা আক্রান্ত হয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁদের

কারও বিশেষ সুবিধে হয়নি। সেক্ষেত্রে যাঁর কপাল সেদিন ঠাণ্ডা ছিল, এবং নাড়ির গতি স্বাভাবিক, সেই হিউম এখন প্রধানমন্ত্রী।

অনেকে ভেবেছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর আসন যত সহজে পাওয়া গেল, মন্ত্রিসভা গঠন করার কাজটা তত সহজ হবে না। তার কারণ, দলের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ ছিল স্পষ্ট। কিন্তু সেই বিদ্রোহের অবসান ঘটাতেও খুব দেরি হয়নি। হীথ, মডলিং, হেলশাম আর বাটলার, চারজনেই তাঁর নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছেন।

এঁদের মধ্যে একমাত্র বাটলারের জন্যেই হয়ত অনেকে ঈষৎ দুঃখবোধ করবেন। মধ্যপ্রদেশের গভর্নর সার মণ্টেগু বাটলারের নাম হয়ত অনেকের মনে আছে। র‍্যাব বাটলার তাঁর পুত্র। সুয়েজ-সঙ্কটের পরে রক্ষণশীল দলের জনপ্রিয়তা ভীষণ হ্রাস পেয়েছিল। তারপর এই পার্টিকে যাঁরা আবার নতুন করে শক্তিমান করে তুলেছেন, র‍্যাব বাটলারের নাম তাঁদের মধ্যে একটু বিশেষ-উল্লেখের দাবি রাখে। তা ছাড়া, যেমন ইডেনের আমলে, তেমনি ম্যাকমিলানের আমলেও তিনি ছিলেন ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী। তাই সঙ্গত কারণেই অনেকে আশা করেছিল যে, বাটলারই এবারে প্রধানমন্ত্রী হবেন। তা যখন হলেন না, তখন প্রশ্ন দেখা দিল, হিউমের নেতৃত্ব তিনি মেনে নেবেন কি না। প্রশ্ন ছিল বাটলারের নিজের মনেও। কিন্তু তবু তিনি বিদ্রোহের পথে পা বাড়ালেন না, হিউমের নেতৃত্বকেই মেনে নিলেন। তার কারণ, প্রধানমন্ত্রিত্বের চাইতে পার্টিকে তিনি বেশী ভালবাসেন। তিনি জানতেন, বিদ্রোহের পরিণামে পার্টি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

পার্টিকে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত করেননি। হিউমের মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়ে পার্টিকে তিনি বাঁচিয়েছেন।

কেমন হবে হিউমের শাসনকাল? ব্রিটেনের ইতিহাসে তাঁর শাসনকাল কি স্মরণীয় হয়ে থাকবে? এখনই তা বলা সম্ভব নয়। আপাতত শুধু তাঁর নীতির কিছু আভাস দেওয়া যেতে পারে।

তাঁর পররাষ্ট্র-নীতির বিষয়ে অন্তত দুটি কথার এখানে উল্লেখ করা দরকার। এক, তিনি কমিউনিজমের ঘোর বিরোধী। দুই, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিয় বন্ধু। সুতরাং, হিউমের আমলে, ব্রিটেন আর আমেরিকার মৈত্রী-বন্ধন হয়ত আরও দৃঢ় হবে।

এদিকে ঘরোয়া রাজনীতিতে যে দুর্নীতি অনেক হ্রাস পাবে, তাতেও সন্দেহ নেই। আর-কিছু না হোক, সরকারকে অতঃপর স্বজনপোষণের অভিযোগ শুনতে হবে না। হিউম সম্পর্কে অন্তত এই কথাটা সকলেই স্বীকার করেন যে, নেপোটিজমের তিনি শত্রু। অনুজ উইলিয়ম ডগলাস হিউম এ নিয়ে বড় চমৎকার একটা মন্তব্য করেছেন। বলেছেন, অ্যালেকের আমলে, "আমাদের বোন ব্রিজেট কদাচ ব্ল্যাকপূলের টোরি-সম্মেলনে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করবে না। আমাদের পক্ষী-বিশারদ ভ্রাতা হেনরিকে কদাচ সেক্রেটারি অব স্টেট ফর স্কটল্যাণ্ড করা হবে না। আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এডওয়ার্ডকে কদাচ দূরপ্রাচ্যের দপ্তরবিহীন মন্ত্রী করা হবে না। এবং ব্রিটেনের প্রতিনিধি হিসাবে আমাকে কদাচ রাষ্ট্রপুঞ্জে পাঠানো হবে না।"

সবই ভাল কথা। কিন্তু হিউম তবুও নিশ্চিন্ত নন। তার কারণ দলের লড়াইয়ে তিনি জিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁর আসল লড়াইটা এখনও বাকী। সাধারণ নির্বাচনের আর বিশেষ দেরি নেই। সেই নির্বাচনে শ্রমিক দলের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্যে এখন থেকেই তাঁকে তৈরি হতে হবে। এবং, কে না জানে, রক্ষণশীল দলের সুনাম এখন যেখানে এসে ঠেকেছে, তাতে আসন্ন সেই সমরে তাঁদের জয়লাভের আশা সত্যিই বড় কম।

অংকেল লুডি

উনিশ বছর আগেকার কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গতি তখন ঘুরে গিয়েছে, এবং মিত্র-বাহিনীদের হাতে নাৎসীদের তখন পাল্টা-মার খেতে হচ্ছে। কিন্তু, পরাজয় যে অনিবার্য, জার্মানিতে কি তখনও কেউ তা ভাবতে পেরেছিলেন? কেউ-কেউ পেরেছিলেন। কিন্তু 'ত্রাণকর্তা' হিটলারের প্রতাপ তখনও এতই প্রবল যে, সেই অপ্রিয় সত্য উচ্চারণের উপায় কারও ছিল না। সেই সময়ে, উনিশ শ চুয়াল্লিশ সালের শীতকালের এক বিষণ্ণ অপরাহ্ণে, জার্মানির একটি বাড়ির বাগানে বসে ছিলেন এক ভদ্রলোক। বসে-বসে তাঁর প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। কথা শেষ হবার পরে, চামড়ার ব্রীফকেসের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে, খুব সন্তর্পণে একটি প্রবন্ধ বার করলেন তিনি; প্রতিবেশীর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "অবসর-সময়ে পড়ে দেখবেন।"

প্রতিবেশীর নাম থিয়োডোর এসকেনবুর্গ। এখন তিনি টুবিনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর। যে-প্রবন্ধটি তাঁর হাতে সেদিন তুলে দেওয়া হয়েছিল, প্রবন্ধ না-বলে তাকে গুরুত্বপূর্ণ একটি দলিল বলাই ভাল। এবং তার প্রথম পংক্তিটি পড়েই তিনি চমকে উঠেছিলেন:

"এ-কথা এখন স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, জার্মানির পক্ষে এই যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব নয়; আর তাই" পরাজিত জার্মানির "যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কী হবে, এই মুহূর্তেই তা আমাদের স্থির করা দরকার।"

পশ্চিম জার্মানির অর্থনৈতিক কর্ণধার লুডভিগ এরহার্ড যে একজন দূরদর্শী এবং নির্ভীক মানুষ, উনিশ বছর আগেকার এই দলিলটি তার প্রমাণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে পারি, লাইপৎসিগের মেয়র কার্ল

ফ্রীডরিষ গোয়েরডেলেরের কাছে, ডাকযোগে, এই দলিলের একটি অনুলিপি তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তার কিছুদিন বাদেই গোয়েরডেলেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে হিটলারের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল, গোয়েরডেলের ছিলেন তার অন্যতম নেতা। গ্রেপ্তারের পর নাৎসীরা তাঁকে হত্যা করে।

এরহার্ড বলেন, "আমাকেও সেদিন তারা হত্যা করতে পারত। কেন যে করেনি, জানি না।"

লুডভিগ এরহার্ডের এই উক্তির মধ্যে, আর যা-ই থাক, আতিশয্য নেই। তিনি ছিলেন ঘোর নাৎসী-বিরোধী ; তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, হিটলারের জার্মানি এক অনিবার্য সঙ্কটের দিকে এগিয়ে চলেছে। নাৎসীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেননি তিনি। এবং এই অসহযোগিতার জন্যেই নাৎসীরা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারত, হত্যা করতে পারত।

যদি করত ? কী হত তাহলে ? কী যে হত, এক কথাতেই তা বলে দেওয়া যায়। এই মানুষটি যদি সেদিন নাৎসীদের হাতে মারা পড়তেন, পরাজিত জার্মান জনসাধারণ এত সহজে তা হলে হয়ত আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারত না। তার কারণ, এরহার্ডের মতন এত দূরদর্শী মানুষ এবং অকুতোভয় অর্থনীতিবিদের সন্ধান পাওয়া কোনও দেশেই খুব সহজ নয় ; এবং যুদ্ধোত্তর জার্মানিতে দ্বিতীয় আর-একজন এরহার্ডকে খুঁজে পাওয়া হয়ত অসম্ভব হত।

অনেকে বলেন, 'মিরাক্‌ল্'। তাঁরা অন্যায় বলেন না। চূড়ান্ত দারিদ্র্যের ভিতর থেকে পশ্চিম জার্মানির জনসাধারণ যেভাবে আজ এক চূড়ান্ত সাচ্ছল্যের ভিতর এসে পৌঁছেছে, একমাত্র 'মিরাক্‌ল' বললেই সেই উত্তরণের যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয়। জার্মান জীবনে সেই 'মিরাক্‌ল' যিনি ঘটিয়েছেন, তাঁর নাম লুডভিগ এরহার্ড। আদর করে জার্মানরা বলে, অংকেল লুডি। লুডি খুড়ো।

জন্ম বাভারিয়ার এক ছোট্ট শহরে। বাবা ছিলেন বস্ত্র-ব্যবসায়ী,

এবং তিনি আশা করেছিলেন যে, লুডভিগ একদিন ব্যবসার দায়িত্ব বুঝে নেবেন। কিন্তু ব্যবসার দায়িত্ব বুঝে নেবার আগেই লুডভিগকে যুদ্ধে যেতে হল। তাঁর বয়স তখন অল্প। কাইজারের হয়ে তিনি লড়তে গিয়েছিলেন, এবং অক্ষত শরীরে তিনি ফিরে আসতে পারেননি। ব্রিটিশ গোলন্দাজের গোলার ঘায়ে সার্জেন্ট এরহার্ড সেদিন সাংঘাতিক আহত হয়েছিলেন। রণাঙ্গন থেকে হাসপাতাল। সাত-সাতটা অপারেশনের পরে যখন তিনি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন, সৈন্যবাহিনীতে তাঁর প্রয়োজন তখন ফুরিয়ে গিয়েছিল। অংকেল লুডির শরীর থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের সেই আঘাতের স্মৃতি আজও মিলিয়ে যায়নি। একটা-হাত অন্যহাতের চাইতে একটু খাটো ; তা ছাড়া আজও তাঁকে একটু খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়।

বিদেশের একটি পত্রিকায় সম্প্রতি তাঁর সম্পর্কে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। পড়ে জানতে পারছি যে, হাসপাতালের বিছানাতেও তাঁর শান্তি ছিল না। বিছানায় শুয়ে তিনি সারাক্ষণ সেদিন চিন্তা করতেন। চিন্তা শুধু তাঁর নিজের জন্যে নয়, জার্মানির জন্যে, জার্মান জনসাধারণের জন্যে। অর্থনীতির কাঠামোটা ভেঙে পড়েছে, দেশ জুড়ে মুদ্রাস্ফীতির রাক্ষস তার থাবা বাড়িয়ে দিয়েছে। চতুর্দিকে তখন দারিদ্র্য আর হাহাকার।

বাবার ব্যবসা ইতিমধ্যে ফেল পড়েছিল। হাসপাতালের বিছানায় শুয়েই তার খবর পেয়েছিলেন এরহার্ড। ভাবছিলেন, হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে তিনি কী করবেন। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়নি। এরহার্ড ঠিক করলেন, তিনি অর্থনীতি পড়বেন।

এলেন ন্যুরেমবের্গে। ন্যুরেমবের্গ স্কুল অব ইকনমিক্স অ্যাণ্ড পোলিটিক্যাল সায়েন্সের প্রধান অধ্যাপক তখন ভিলহেলম রাইগার। বিখ্যাত সেই অধ্যাপকের কাছে অর্থনীতির পাঠ নিয়েছেন এরহার্ড। পরে, ফ্রাঙ্কফুর্টে এসে ওপেনহাইমারের সান্নিধ্য পেয়েছেন। অনেকে বলেন, ওপেনহাইমারই তাঁর প্রকৃত শিক্ষাগুরু।

ওপেনহাইমার ছিলেন খেয়ালী মানুষ। তাঁর সম্পর্কে বড় মজার একটা গল্প বলেন এরহার্ড। বলেন, "তাঁর সঙ্গে একদিন আমি বাভারিয়ার পাহাড়ী পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। চড়াই ভাঙতে-ভাঙতে যখন সাড়ে সাত হাজার ফুট উপরে উঠে এসেছি, তখন হাঁটতে-হাঁটতেই তিনি অর্থনীতির বিষয়ে একগাদা প্রশ্ন করলেন আমাকে। তারপর আমার উত্তর শুনে খুশী হয়ে বললেন, 'তোমাকে ডক্টরেট দেওয়া হল।' পৃথিবীতে বোধহয় এত 'উঁচু' ডক্টরেট আর কেউ কখনও পায়নি।"

ওপেনহাইমার ছিলেন ইহুদী, এবং ইহুদী-বিদ্বেষী হিটলারের হাতে তাঁকে কম নির্যাতন সহ্য করতে হয়নি। বস্তুত, হিটলার ক্ষমতায় আসার কিছুকাল বাদেই তাঁকে জার্মানি ছাড়তে হয়েছিল। নাৎসীদের সম্পর্কে এরহার্ডের অশ্রদ্ধা তাতে বেড়েছে বই কমেনি।

নাৎসীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেননি এরহার্ড। নিজের চেষ্টায় ছোট্ট একটা 'মার্কেট রিসার্চ ইনস্টিটিউট' গড়ে তুলেছিলেন তিনি, এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও—নাৎসীদের সান্নিধ্য বর্জন করে—তিনি সেই ইনস্টিটিউটের কাজের মধ্যে মগ্ন হয়ে ছিলেন। ১৯৪৪ সনেই তিনি বুঝতে পারেন যে, জার্মানির পরাজয় অনিবার্য। বুঝতে পারেন, পরাজিত পর্যুদস্ত জার্মানিকে আবার স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলবার প্রশ্নটা আর সামান্যকাল বাদেই বড় জরুরী হয়ে দেখা দেবে। তখন থেকেই এরহার্ড সেই জরুরী প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে থাকেন। সে-কথা আগেই বলেছি।

উত্তর তিনি খুঁজে পেয়েছেন। এবং সেই উত্তর যে অভ্রান্ত, আজ তা সকলে স্বীকার করলেও, লুডভিগ এরহার্ডের বৈষয়িক ব্যবস্থার সাফল্য সম্পর্কে মাত্র বছর পনের আগেও অনেকের ঘোরতর সন্দেহ ছিল।

এরহার্ডের ছিল না। আর তাই, যুদ্ধোত্তর জার্মানিতে দখলদার

মিত্র-বাহিনী যে-সব রেশন আর কণ্ট্রোল প্রথা চালু করেছিলেন, ১৯৪৮ সনেই এরহার্ড সেগুলি তুলে দেন। তিনি তখন বাইজোনাল ইকনমিক কাউন্সিলএর চেয়ারম্যান। মার্কিন সেনাপতি জেনারেল লুসিয়াস ডি ক্লে সেদিন তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "এ আপনি কী করলেন? আমার উপদেষ্টারা ত বলছেন যে, আপনার এই ব্যবস্থার ফলে জার্মানি একেবারে দেউলে হয়ে যাবে।"

শুনে হেসেছিলেন এরহার্ড। বলেছিলেন, "ভয় পাবেন না জেনারেল। শুধু আপনার উপদেষ্টারা কেন, আমার উপদেষ্টারাও ঠিক এই একই কথা বলছিলেন। কিন্তু তবু আমি এই ব্যবস্থা নিয়েছি।"

তবু কেন এই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন এরহার্ড? উপদেষ্টাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে তবু কেন সেদিন রেশন আর কণ্ট্রোল তুলে দিয়েছিলেন তিনি? উত্তরটা তাঁর নিজের কথাতেই দেওয়া যাক। "আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, বৈষয়িক অবনতির একেবারে শেষ ধাপে আমরা নেমে এসেছি। যে অবনতি হয়েছে, তার চাইতে বেশী অবনতি আর হওয়া সম্ভব নয়।"

বরং ওই শক-ট্রিটমেণ্টের ফলেই হয়ত অবস্থা আবার ঘুরে যেতে পারে। শক-ট্রিটমেণ্টের ব্যবস্থাটাকে পাকা করে তাই খুশী মনেই সেদিন জেনারেল ক্লের অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন এরহার্ড। ফেরার পথে সেদিন তিনি মস্ত একটা সিগার কিনেছিলেন। বাজারের সবচাইতে বড় মাপের সিগার।

চার্চিলের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য শুধুই বপুর বিশালতায় নয়, সিগারেও। পরিসংখ্যান নিয়ে যাঁদের কারবার, তাঁরা হিসেব করে দেখেছেন যে, গত সাতাশ বছরে এই মানুষটি যতগুলি সিগার পুড়িয়েছেন, তার সম্মিলিত দৈর্ঘ্য প্রায় তের মাইল। সিগার পোড়াতে তিনি ভালবাসেন, এবং ওজন কমাতেও তিনি রাজী নন। এমন কী, কেউ তাঁকে দেখে ভাববে যে, তাঁর ওজন কমছে, তাও তিনি চান না। একটা ঘটনার

কথা বলি। জ্যাকেটটাকে যাতে বড্ড বেশী আঁট না দেখায়, তার জন্যে একবার এক দর্জি তাঁর জ্যাকেটের একটা বোতামকে একটু সরিয়ে বসাতে চেয়েছিল। এরহার্ড তাতে রাজী হননি। বলেছিলেন, "না, না, বোতামটিকে ওখান থেকে সরিয়ে বসাবার দরকার নেই। সবাই ভাববে যে, আমি রোগা হয়ে গেছি।"

রোগা তিনি হননি, এবং স্ফীতকায় সেই মানুষটি এখন জার্মান জনজীবনের স্ফীত সাচ্ছল্যেরই প্রতীক হয়ে উঠেছেন। সার্থক প্রতীক। কেননা, জার্মানির সাচ্ছল্যের মুলে রয়েছেন এরহার্ড। তাঁর অর্থনীতিই সেই সচ্ছলতার ভিত্তি।

সেই সাচ্ছল্য যে এত দ্রুত ঘটবে, স্বপ্নেও কি তা কেউ ভাবতে পেরেছিল? ১৯৪৮ সালের কথা ভাবা যাক। জার্মানির অধিকাংশ মানুষই তখন পেট পুরে খেতে পেত না, অধিকাংশ বাড়িই তখন বোমার ঘায়ে বিচূর্ণ, গ্রামগুলি তখন দারিদ্র্যজর্জর আর শহরগুলি তখন শ্মশানে পরিণত হয়েছে। জার্মান মুদ্রার কোনও মূল্যই তখন ছিল না, এবং কফি কিংবা সিগারেট দিয়ে তখন মুদ্রার কাজ চালাতে হত।

অথচ পশ্চিম জার্মানির আজকের চেহারা একেবারে আলাদা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর ব্রিটেনের পরেই তার স্থান। শিল্পোৎপাদনে সে অদ্বিতীয় না হক, দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। ১৯৫০ সনের পর মাত্র তেরো বছরের মধ্যেই তার রপ্তানির পরিমাণ শতকরা প্রায় সাত শ ভাগ বেড়ে গিয়েছে। এবং তার সমৃদ্ধির বহর দেখে ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশেরই আজ চোখ টাটায়। চোখ টাটানো অস্বাভাবিক নয়। তার কারণ, জয়ী দেশগুলির তুলনাতেও পরাজিত-জার্মানি আজ অনেক ক্ষেত্রেই অনেক বেশী এগিয়ে গিয়েছে এবং পৃথিবীর অনেক দেশই আজ জার্মান সাহায্যের মুখাপেক্ষী।

আবার বলি, এই পরিবর্তনের মূলে রয়েছেন এরহার্ড।

পরিবর্তনটাকে অনেকে 'মিরাক্‌ল' বলে বর্ণনা করেন। সে-কথা আগেই বলেছি। যে-কথা বলিনি সেটা এই যে, 'অংকেল লুডি' নিজে কিন্তু এই পরিবর্তনটাকে মোটেই অস্বাভাবিক বলে মনে করেন না। তাঁর বিশ্বাস, জনসাধারণ যদি খাটতে রাজী থাকে, এবং দেশের বৈষয়িক নীতি যদি নির্ভুল হয়, সমৃদ্ধি তাহলে অনিবার্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আডেনাওয়ারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে যে বৈষয়িক নীতি তিনি অবলম্বন করেছিলেন, তা'র মধ্যে কোনও জটিলতা নেই। তাঁর অর্থনীতির মূল কথাটি খুব সহজ। তিনি বিশ্বাস করেন যে, উৎপাদন বাড়াতে হলে দেশের অর্থনীতিটা এমন হওয়া চাই, উৎপাদকরা যাতে উৎসাহ পায়। কন্ট্রোলের ব্যবস্থা যত কম থাকে, ততই ভাল। সেইসঙ্গে, বাজারে সব সময়েই একটা প্রতিযোগিতার ভাব থাকা দরকার। তাঁর নীতি আসলে ফ্রী মার্কেটের নীতি, এবং সেই নীতি অনুসরণ করে যে সুফল তিনি পেয়েছেন, তা বিস্ময়কর। বিস্ময় মেনেছেন কমিউনিস্ট দেশের কর্তারাও। তা নইলে তাঁর 'সকলের জন্যে সমৃদ্ধি' নামক সেই বইখানি নিশ্চয়ই মস্কোতে অনূদিত হত না।

আডেনাওয়ার পদত্যাগ করেছেন। আসছেন এরহার্ড। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার আগেই তিনি হয়ত চ্যান্সেলরের আসনে অধিষ্ঠিত হবেন। পশ্চিম জার্মানির রাজনীতিতে কি এর ফলে কোনও বড় রকমের পরিবর্তন দেখা দেবে? প্রশ্নটা অকারণ নয়। বস্তুত আটলান্টিকের দুই পারেই এই প্রশ্নটা এখন খুব জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে।

পরিবর্তন ঘটতে পারে কমন মার্কেটের বিন্যাসে। অন্তত ঘটলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সবাই জানেন যে, ব্রিটেন আজও কমন মার্কেটে যোগ দেয়নি। দেওয়া যে সম্ভব হয়নি, ফরাসী নেতা দ্যগলের অনমনীয় মনোভাবই তার মূল কারণ। এবং দ্যগল—যেমন

নীতির ব্যাপারে এরহার্ড একজন পাকা মানুষ বটে, কিন্তু রাজনীতির ব্যাপারে কিছুটা কাঁচা। গত এপ্রিলে এক টেলিভিশন-সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, এরহার্ডের যোগ্যতা তিনি অস্বীকার করেন না, তবে কিনা ফেডারেল রিপাবলিকের "যিনি চ্যান্সেলর হবেন, তার মেজাজটা হওয়া চাই রাজনীতিকের মেজাজ।" শুধু তাই নয়, শোনা যায় যে, এরহার্ড যখন ফরাসী-জার্মান চুক্তির ব্যাপারে তাঁর আপত্তি জানিয়েছিলেন, আডেনাওয়ার তখন মোটেই খুশী হননি। বলেছিলেন "হের এরহার্ড দেখা যাচ্ছে পররাষ্ট্র-নীতিটা ঠিক বোঝেন না। তাঁর অতএব অর্থনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকা ভাল।" আডেনাওয়ারের আরও-একটা চমকপ্রদ মন্তব্য: "আমার চিত্রকর হবার যোগ্যতা যতটুকু, হের এরহার্ডের চ্যান্সেলার হবার যোগ্যতা তার চাইতে বেশী নয়।"

বলা বাহুল্য, অর্থমন্ত্রী হিসেবে যিনি অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, চ্যান্সেলর হিসেবে তাঁর যোগ্যতা পরিমাপের সময় এখনও আসেনি। তবে জার্মানিতে তাঁর জনপ্রিয়তা যে আজ অসামান্য, তাতে সন্দেহ নেই। আর তা ছাড়া, সদাহাস্যময় এই মানুষটি যে নিতান্ত নরম প্রকৃতির মানুষ, এমন কথাও ভাবা ঠিক নয়। তাঁর নিজস্ব একটা নীতি আছে, নিজস্ব একটা আদর্শ আছে। এবং অনুমান অসঙ্গত নয় যে, বাইরের অবস্থা যদি অনুকূল না হয় এবং ভিতরের অবস্থাও যদি প্রতিকূল হয়ে ওঠে, তবু তাঁর সেই নীতি আর আদর্শে তিনি অটল থাকতে পারবেন। প্রসঙ্গত বিদেশী একটি পত্রিকার মন্তব্য এখানে তুলে দিচ্ছি।

"....it can be safely assumed that Herr Erhard has a mind of his own....and is resolved to resist any attempt at back-seat driving." (The Economist, London.)

এরহার্ড নিজে অবশ্য এতটা দাবি করেন না। দরকার মতো তিনি শক্ত হতে জানেন, এবং পশ্চিম জার্মানির হাল তিনি হয়ত শক্ত

অন্যান্য ব্যাপারে, তেমনি এই ব্যাপারেও—আডেনাওয়ারকে তাঁর বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলেন। ইতিহাস সাক্ষী, জার্মানি আর ফ্রান্সের সম্পর্ক কোনওকালে মধুর ছিল না। বিরোধ ছিল মজ্জাগত। সেই পুরনো বিরোধকে বিসর্জন দিয়ে আডেনাওয়ারের পশ্চিম জার্মানি আর দ্যগলের ফ্রান্স আজ পরস্পরের অনেক কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পশ্চিম জার্মানির নূতন নায়ক ডঃ এরহার্ড যদিও ফ্রান্সের শত্রুতা কামনা করেন না, ব্রিটেনকেও তিনি বন্ধু হিসেবে পেতে চান। সুতরাং স্বভাবতই তিনি চাইবেন যে, ব্রিটেনও এবারে কমন মার্কেটের সদস্য হোক। তার জন্য দ্যগলকে যদি কিছুটা চাপ দিতে হয়, তবে তাও হয়ত তিনি দেবেন।

সমস্যা শুধুই কমন মার্কেট নিয়ে নয়, সমস্যা আরও অনেক। সব চাইতে বড় সমস্যা হচ্ছে দুই জার্মানির মিলনের। জার্মানি আজ দু-টুকরো হয়ে আছে। সেই টুকরো দুটো কি আবার জোড়া লাগবে? অচিরে লাগবে? বলা বাহুল্য, আমেরিকা আর রাশিয়ার মধ্যে এখন যে বন্ধুত্বের হাওয়া বইছে, তাতে, আর যা-ই হক, দুই জার্মানির পুনর্মিলনের সম্ভাবনা মোটেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। বরং পশ্চিম জার্মানির জনসাধারণের ধারণা, আণবিক পরীক্ষা স্থগিত রাখার চুক্তিটা যেন পুব জার্মানির অস্তিত্বকে এক-হিসেবে স্বীকৃতি দান করেছে। শুধু তাই নয়, জার্মানদের চিত্তে আজ এমন আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে যে, তাদের মতামতকে আমল না-দিয়েই হয়ত আমেরিকা আর রাশিয়ার মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে যেতে পারে। যদি হয়, দুই জার্মানির পুনর্মিলনের স্বপ্ন তাহলে মিলিয়ে যাবে না ত?

পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলর হিসেবে এরহার্ডকে যে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে, তাতে সন্দেহ নেই। সম্মুখীন হবার জন্যে যে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি থাকা দরকার তা তাঁর আছে।

কিন্তু, শক্ত-মানুষ আডেনাওয়ার কি তা বিশ্বাস করেন? করলে আরও আগেই তিনি অবসর নিতেন। আসলে, তাঁর বিশ্বাস, অর্থ-

হাতেই ধরতে পারবেন, কিন্তু আসল কথাটা এই যে, ক্ষমতার খেলায় তাঁর রুচি নেই। তা ছাড়া তিনি বিনয়ী মানুষ। সম্প্রতি এক বিদেশী পত্রিকার প্রতিনিধিকে তিনি বলেছেন, যদি দরকার হয় ত "আমি আমার ইনস্টিটিউটেই আবার ফিরে যাব। এবং খুশী মনেই ফিরে যাব।"

ওপেনহাইমারের শিষ্য এ-কথা অনায়াসেই বলতে পারেন। কেননা রাজনৈতিক ক্ষমতার চাইতে অর্থনৈতিক গবেষণার আকর্ষণ তাঁর কাছে কিছু কম নয়, বরং অনেক বেশী।

মালয়েশিয়ার টুঙ্কু

তোকিয়োয় তাঁরা মিলিত হয়েছিলেন। মালয়ের টুঙ্কু আবদুল রহমান আর ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ। কাগজে তাঁদের ছবি ছাপা হয়েছিল। তাঁরা হাসছিলেন। বড় মধুর, বড় নির্মল সেই হাসি। যুগল নেতার হাসি দেখে সবাই স্বস্তি পেয়েছিল। ভেবেছিল, তাঁরা একমত হয়েছেন। মুশকিল এই যে, একমত হয়ে হেসে উঠতে যেমন এই মানুষ দুটির দেরি হয় না, তেমনি আবার প্রায়-ক্ষেত্রেই দেখা যায়, "দে পার্ট উইথ ডিফারেন্ট আইডিয়াজ অ্যাবাউট হোয়ট দে এগ্রিড অন।" বিলিতী কাগজ 'ইকনমিস্ট'-এর এই ঠাট্টাটা একেবারে অকারণ নয়। কী সম্পর্কে সেদিন একমত হয়েছিলেন টুঙ্কু আর সুকর্ণ? মালয়েশিয়া সম্পর্কে? মালয়ের প্রধানমন্ত্রী আর ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টকে যদি এই প্রশ্ন করা যায়, তাঁদের উত্তর সম্ভবত এক হবে না।

শুরুর থেকে শুরু করি। মালয়েশিয়ার প্ল্যানটা প্রথম কার মাথায় এসেছিল? টুঙ্কু বলেন, তাঁর। বলেন, "আমিই এই নতুন রাষ্ট্রের জনক।" কিন্তু, মালয়ের প্রধানমন্ত্রীর এই দাবিকে বোধহয় এককথায় মেনে নেওয়া যায় না। তার কারণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ছিটেফোঁটা উপনিবেশগুলিকে যাতে ঠিক-মতন গুছিয়ে রেখে সেখান থেকে বিদায় নেওয়া যায়, ব্রিটেন তার জন্যে বিগত কয়েক বছর ধরেই একটি ফেডারেশন গড়ার কথা বলে এসেছে।

তার উপরে রয়েছে সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লী কুয়ান ইউয়ের দাবি। কমিউনিস্টরা তাঁর রাজ্যে অতি দ্রুত প্রাধান্য লাভ করেছিল, এবং ধর্মঘট আর দাঙ্গা বাধিয়ে তাঁর সরকারকে প্রায় বানচাল করে দেবার উপক্রম করেছিল। পারেনি। কিন্তু লী কুয়ান ইউ বুঝতে

পেরেছিলেন যে, এইভাবে আর বেশীদিন চলবে না। প্রথমে তিনি কমিউনিস্টদের সঙ্গে একটা রফা করবার চেষ্টা করেছিলেন ; পরে, তাতে সুবিধে না-হওয়ায়, নিয়েছিলেন মধ্যপন্থা। এবং তারও পরে, তাঁর কোয়ালিশন সরকারের ভবিষ্যৎ যে বিশেষ উজ্জ্বল নয়, সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মালয়ের রাজধানী কুয়ালালামপুরে এসে টুঙ্কুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। টুঙ্কুকে বুঝিয়েছিলেন, সিঙ্গাপুর যদি কমিউনিজমের পথে পা বাড়ায়, তাহলে মালয়ের ভবিষ্যৎও অন্ধকার।

সুতরাং ?

সুতরাং মালয় আর সিঙ্গাপুর যুক্ত হক।

টুঙ্কু আজ বলছেন যে, তিনি মালয়েশিয়ার জনক। কিন্তু ইতিহাস বলবে, লী কুয়ান ইউয়ের প্রস্তাবে সেদিন তিনি বিশেষ উৎফুল্ল বোধ করেননি।

উৎফুল্ল না-হবার কারণ ছিল।

ইতিহাস, সংস্কৃতি আর অর্থনীতির রায় অবশ্য সংযুক্তির ইচ্ছাকেই সমর্থন করবে। মালয় আর সিঙ্গাপুরের ইতিহাস এক, সংস্কৃতি এক, অর্থনীতিও অভিন্ন। এ দুই দেশের স্থানীয় মানুষ অর্থাৎ মালয়ীরা "একই ভাষায় কথা বলে, একই কাগজ পড়ে, একই ফিল্ম দেখে এবং রেডিয়ো খুলে একই প্রোগ্রাম শোনে।" ভূগোলও তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখেনি। মালয় আর সিঙ্গাপুরের মধ্যে জলের ব্যবধান নামমাত্র। কিন্তু তবু…

টুঙ্কু তবু উৎফুল্ল হতে পারেননি। তিনি জানতেন যে, মালয় আর সিঙ্গাপুরের মধ্যে বৈষম্যও বড় বেশী। মালয় সচ্ছল দেশ ; সিঙ্গাপুরের আর্থিক কাঠামো সেই তুলনায় অনেক দুর্বল। মালয় থেকে কমিউনিস্টদের প্রায় উচ্ছেদ করা হয়েছে ; কিন্তু সিঙ্গাপুরে তাদের শক্তি দিনে দিনে বেড়েছে বই কমেনি। মালয় মোটামুটি শান্ত জায়গা ; কিন্তু সিঙ্গাপুরের রাজনীতিতে প্রায় সারাক্ষণ অশান্তি লেগে

আছে। মালয়ে যে বেকার-সমস্যা নেই এমন নয়; কিন্তু সিঙ্গাপুরের বেকার-সমস্যা অনেক বেশী তীব্র। এ-সবই টুঙ্কুর পক্ষে দুর্ভাবনার কথা। তাঁকে ভাবতে হয়েছিল, সিঙ্গাপুরের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে মালয়কেই শেষ পর্যন্ত মারা পড়তে হবে কিনা।

সবচাইতে বড় দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছিল 'হুয়াচিয়াও' অর্থাৎ প্রবাসী চীনাদের নিয়ে। 'হুয়াচিয়াও'দের সংখ্যা মালয়েও নেহাত কম হবে না, কিন্তু সিঙ্গাপুরে তারাই সংখ্যাগুরু। বাইরে থেকে যদি কেউ সিঙ্গাপুরে যান, তাহলে মানুষজনের মুখ দেখে তাঁর হঠাৎ হয়ত মনে হতে পারে যে, সিঙ্গাপুরে নয়, তিনি চীনে এসেছেন। সেখানকার মোট জনসংখ্যা সতের লক্ষ। তাঁর মধ্যে তের লক্ষই চীনা।

লী কুয়ান ইউয়ের মিলন-প্রস্তাবে যদি টুঙ্কু তক্ষুনি সায় না-দিয়ে থাকেন, তাতে অতএব বিস্ময়ের কিছু নেই। টুঙ্কু বুঝতে পেরেছিলেন, মিলিত রাষ্ট্রে চীনারাই শেষ পর্যন্ত প্রবল হয়ে দাঁড়াবে।

যাতে না হয়, তার উপায় চিন্তা করতে হয়েছে টুঙ্কুকে। তার কারণ, মিলন-প্রস্তাবে তিনি তক্ষুনি সায় দেননি বটে, কিন্তু প্রস্তাবটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি অদূরদর্শী মানুষ নন। সিঙ্গাপুর যদি কমিউনিস্টদের দখলে যায়, তাহলে মালয়ের ভবিষ্যৎ নিয়েও যে উদ্বেগ দেখা দেবে, এই সহজ কথাটা তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। অগত্যা তাঁকে ভাবতে হয়েছে, চীনাদের দাবিয়ে রেখেও কী করে একটি মিলিত রাষ্ট্র গড়ে তোলা যায়। উপায় নির্ধারণে দেরি হয়নি। স্থির হয়েছিল, মিলিত রাষ্ট্র যদি গড়তেই হয়, তাহলে শুধু মালয় আর সিঙ্গাপুরকে নিয়ে তা গড়া হবে না; এমন আরও কয়েকটি অঞ্চলকে তার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে, চীনাদের সংখ্যা যেখানে অনেক কম। মোট জনসংখ্যার বিচারে তাহলে চীনারা কিছু পিছিয়ে পড়বে।

সেই 'আরও কয়েকটি অঞ্চল' হচ্ছে সারাবক, ব্রুনেই আর উত্তর-বোর্নিও। পঞ্চ অঞ্চলের (মালয়, সিঙ্গাপুর, সারাবক, ব্রুনেই, উত্তর

বোর্নিও) মোট জনসংখ্যা এক কোটি। তার মধ্যে চীনাদের সংখ্যা মোটামুটি চল্লিশ লক্ষ ; অর্থাৎ অর্ধেকের কম। ব্রুনেই অবশ্য এই ফেডারেশনে যোগ দিতে রাজি হয়নি ; শেষ মুহূর্তে সে পিছিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ব্রুনেইয়ের লোকসংখ্যা নেহাতই নগণ্য, মাত্র চুরাশি হাজার। সুতরাং বাকী চারটি অঞ্চল নিয়েও যদি ফেডারেশন গড়া হয়, 'হুয়াচিয়াও'দের সংখ্যা তাহলে সেই মিলিত রাষ্ট্রে একটা ভয়াবহ সমস্যা হয়ে দেখা দেবে না।

গড়ার কাজ অবশ্য ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। এখন শুধু প্রতিষ্ঠার কাজ বাকী। তাও হয়ে যেত। হয়নি প্রধানত ইন্দোনেশিয়া আর ফিলিপাইনসের বিরোধিতায়। কথা ছিল, ৩১শে আগস্ট (মালয়ের 'মারডেকা' অর্থাৎ স্বাধীনতা দিবসে) মালয়েশিয়ার প্রতিষ্ঠা হবে। সুকর্ণ তাতে বাদ সাধলেন। তাঁর দাবি ঃ ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার আগে দেখতে হবে, সারাবক আর উত্তর-বোর্নিওর মানুষরা এই সম্মিলনে সত্যিই সম্মত কিনা। অথচ, সম্মতি যে তাদের বিলক্ষণ আছে, সারাবক আর উত্তর-বোর্নিওর বিগত সাধারণ নির্বাচনে মিলন-বিরোধী দলের পরাজয়ই তার প্রমাণ। সুকর্ণ তবু খুশী নন ; এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধিরা তাই এখন আবার নতুন করে এই অঞ্চল দুটির জনমত নির্ণয় করছেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর তাঁদের সমীক্ষার ফল জানা যাবে। মালয়েশিয়া প্রতিষ্ঠিত হবে তার দু দিন পরে। ১৬ই সেপ্টেম্বর।

আগেই আভাস দিয়েছি, টুঙ্কু এই মিলন-পরিকল্পনার জনক নন। কিন্তু টুঙ্কুর দূরদৃষ্টি ছাড়া যে এই পরিকল্পনা এত ব্যাপক আয়তন পেত না, এবং তাঁর উদ্যম বিহনে যে এই পরিকল্পনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হত, তাতে সন্দেহ করিনে। তার কারণ, হুয়াচিয়াও-গোষ্ঠী এবং তাদের রক্তাভ বন্ধুবান্ধবদের দাপট আজ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সত্যিই কম নয়, এবং তাদের বিরুদ্ধে একটা শক্ত প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলবার মতন শক্তি সেখানে আজ মাত্র কয়েকটি মানুষেরই আছে। টুঙ্কু আবদুল রহমান সেই স্বল্পসংখ্যকদেরই অন্যতম।

কেমন মানুষ টুঙ্কু আবদুল রহমান? গত অক্টোবরের চীন-ভারত সংঘর্ষের সময়ে এশীয় নেতাদের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি ভারতকে তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন, এবং ভারতীয় রক্ত-ভাণ্ডারে যাঁর স্ত্রী সেদিন রক্তদানে কুণ্ঠিত হননি, কেমন মানুষ তিনি?

জন্ম রাজপ্রাসাদে। খেদার সুলতানের ষষ্ঠ পত্নীর তিনি সপ্তম পুত্র। জননী শ্যামদেশীয়া; এবং বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত বৃত্তান্ত পাঠ করে জানা গেল যে, জননীর ইচ্ছানুযায়ী, বাল্যকালে এই মানুষটি নাকি বেতনভোগী বাহকের কাঁধে চড়ে বিদ্যালয়ে যেতেন। পড়াশুনোয় বিশেষ কৃতী ছিলেন না, তবে রাজকুলে জন্ম বলেই বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ হবার পরে একটি বৃত্তি নিয়ে তাঁর পক্ষে বিদেশ যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

পরবর্তী বছরগুলি কেম্ব্রিজে কেটেছে। টুঙ্কু সেখানে আইনের ছাত্র ছিলেন। তবে পরীক্ষা দেননি। তার বদলে আড্ডা দিতেন, পার্টিতে যেতেন, নাচতেন, হাওয়া খেয়ে বেড়াতেন। বেড়াতেন তাঁর বিলেতে-কেনা গাড়িতে; এবং বিদেশী পত্রিকার খবর থেকেই জানা গেল যে, ট্রাফিক-আইন লঙ্ঘনের অপরাধে তখন আঠাশবার তাঁকে আদালতে যেতে হয়েছিল।

শিক্ষালাভের জন্য বিদেশে গিয়েছিলেন টুঙ্কু। কিন্তু তাঁর প্রকৃত শিক্ষা শুরু হল স্বদেশে ফিরবার পর। সুলতানের ষষ্ঠ পত্নীর সপ্তম পুত্র। উত্তরাধিকারের ক্রমিক তালিকায় বড়-বেশী নীচে ছিল তাঁর নাম; জীবনে কখনও সুলতানি পাবেন, এমন আশা ছিল না। মাঝারি গোছের সরকারী চাকরি নিয়ে তিনি দেশে ফিরলেন। কর্মস্থল শহর থেকে দূরে। কখনও হাতির পিঠে চড়ে, আবার কখনও-বা নিতান্ত পায়ে হেঁটে তাঁকে তখন মাইলের পর মাইল ঘুরতে হয়েছে। কেম্ব্রিজের সেই ক্লাস-পালানো ছাত্রটির তাতে লাভ ছাড়া লোকসান হয়নি। সবচাইতে বড় লাভ: তাঁর দেশকে এবং দেশের মানুষকে তিনি সেদিন খুব স্পষ্ট করে চিনতে পেরেছিলেন। সেই পরিচয়ের

বন্ধন আজও শিথিল হয়নি। টুঙ্কুর এক সহকারীর বিশ্বাস, "মালয়ীদের উনি যত ভাল চেনেন, এমন আর কেউ না।" টুঙ্কু নিজেও সে-কথা অস্বীকার করেন না। বলেন, "আই হ্যাভ দি ফীল্ অব দি পীপ্ল্। আই হ্যাভ দি টাচ্।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে মালয় অকস্মাৎ রণাঙ্গনে পরিণত হল। কিন্তু জাপানীরা সেদিন টুঙ্কুকে তাঁর চাকরি থেকে বিদায় দেয়নি। এদিকে, প্রকাশ্যে যা-ই করুন, গোপনে-গোপনে ব্রিটিশ গেরিলাদের সঙ্গে যোগ রেখেছিলেন টুঙ্কু, জাপ-বিরোধী সংগ্রামে সাহায্য জুগিয়ে যাচ্ছিলেন। যুদ্ধ যখন শেষ হল, টুঙ্কুর বয়স তখন বিয়াল্লিশ। যৌবনে তিনি পড়াশুনোয় ফাঁকি দিয়েছিলেন। কে জানে, সেই ক্ষতিটাকে পুষিয়ে নেবার জন্যেই হয়ত, বিয়াল্লিশে আবার বিলেতে গেলেন তিনি। উদ্দেশ্য: আইনের ডিগ্রী লাভ। স্বাধীনতাকামী প্রবাসী মালয়ী ছাত্রদের সঙ্গে সেখানে দিনের পর দিন তাঁর আলোচনা হয়েছে। তারা তাঁকে 'ব্ল্যাক আঙ্কল' বলে ডাকত। ডিগ্রী নিয়ে যখন দেশে ফিরলেন, নিজের কর্মসূচী সম্পর্কে টুঙ্কুর মনে আর তখন কোনও সংশয় ছিল না।

ফিরে এসে যোগ দিলেন সংযুক্ত মালয় জাতীয়তাবাদী দলে। নেতার আসনে উন্নীত হতে তাঁর দেরি হয়নি, এবং নেতৃপদে বৃত হবার পরেই তিনি তাঁর বিলাস-ব্যসন সম্পূর্ণ পরিহার করেছিলেন। গাড়িবাড়ি ইত্যাদি বেচে দিয়ে, নিতান্ত সাধারণ অবস্থার একজন মালয়ীর মতই, মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি; ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসান ঘটাবার জন্য দেশ জুড়ে শুরু করলেন তাঁর সংগঠনের কাজ। টুঙ্কু বলেন, "আমি তখন বেহুঁশের মতন কাজ করেছি। চলন্ত ট্রেনই আমার বাড়ি হয়ে উঠেছিল। ট্রেনেই ঘুরতাম, ট্রেনেই খেতাম, ট্রেনেই ঘুমোতাম। মাসের মধ্যে দু-চার দিনের জন্যে বাড়িতে আসা—তাও অনেক সময় সম্ভব হয়ে উঠত না।"

পঞ্চান্নর নির্বাচনে দারুণ জিতল তাঁর পার্টি। কিন্তু মালয়ে তখন

কমিউনিস্ট বিদ্রোহ দমনের কাজ চলছিল। টুঙ্কুর তাই আশঙ্কা হল যে, এই অছিলায় ব্রিটিশ সরকার হয়ত মালয়কে স্বাধীনতা দিতে অস্বীকার করবেন; স্বাধীনতা লাভে বিলম্ব ঘটবে। কমিউনিস্টদের সঙ্গে একটা রফা করা যায় কিনা, সেটা বুঝবার জন্য টুঙ্কু তখন কমিউনিস্ট বিদ্রোহের নেতাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কমিউনিস্টদের প্রসঙ্গ উঠলে এখন তিনি বলেন, "সেবারকার সেই আলোচনার পরেই ওদের আমি চিনে নিয়েছি। ওদের কখনও পরিবর্তন ঘটে না। স্বাধীন মালয়ে ওদের সঙ্গে আমাদের সহাবস্থান সম্ভব নয়।"

ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালাতেও তাঁর দম বেরিয়ে গিয়েছিল। অনেক রকমের ফ্যাকরা তুলেছিলেন ব্রিটিশ সরকার; স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে নানানভাবে জট পাকিয়ে তুলেছিলেন। কিন্তু টুঙ্কুর ধনুর্ভঙ্গ পণ: ১৯৫৭ সনের ৩১শে আগস্টের মধ্যে স্বাধীনতা চাই। ঠাট্টা করে টুঙ্কু বলেন, "শ্যামদেশের লোকদের চেনেন ত? নতিস্বীকারের ইচ্ছে না-থাকলে তারা বোকা সাজে। এমন ভাব দেখায় যেন প্রতিপক্ষের যুক্তিগুলিকে তারা বুঝতেই পারছে না। তা আমার মা ছিলেন শ্যামদেশের মেয়ে।"

তাই বোকা সাজতে টুঙ্কুর বিশেষ অসুবিধে হয়নি। এবং ব্রিটিশ সরকারের অনিচ্ছার কাছে এক ইঞ্চি নতিস্বীকার না করে তিনি তাঁর নিজের দাবিকে আদায় করে নিয়েছিলেন।

আজ তিনি স্বাধীন মালয়ের অবিসংবাদী নেতা। কাল তিনি মালয়েশিয়ার নেতা হবেন।

মালয়েশিয়ার প্রতিষ্ঠায় সুকর্ণের এত আপত্তি কেন? ইন্দোনেশিয়ায় এখন কমিউনিস্টরা খুবই শক্তিশালী, এবং সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি যে চীনাপন্থার পথিক, সে-কথা সবাই জানেন। এদিকে মালয়েশিয়ার উদ্যোগটাকে চীন মোটেই সুনজরে দেখছে না। সুতরাং প্রশ্ন উঠবে, ফেডারেশনকে বানচাল করবার জন্যে কমিউনিস্টরাই সুকর্ণকে চাপ দিচ্ছে না ত? সেটা বিচিত্র নয়। কিন্তু সুকর্ণ সে-কথা

স্বীকার করছেন না। বরং এর উল্টো-যুক্তিই তিনি দেখাচ্ছেন। বলছেন, মালয়েশিয়া প্রতিষ্ঠিত হলে সিঙ্গাপুরের চীনা সন্ত্রাসবাদীরা খুব সহজেই এই সংযুক্ত রাষ্ট্রের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়তে পারবে, এবং তাদের প্রাধান্যও তার ফলে বিস্তৃত হবে। ইন্দোনেশীয় বোর্নিও তখন বিপন্ন হতে পারে।

বিপদ ঘটতে পারে ফিলিপাইনস-এরও। এবং ফিলিপাইনস-এর প্রেসিডেন্ট মাকাপাগাল যখন আশঙ্কা করেন যে, মালয়েশিয়ায় শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্টরাই প্রাধান্য লাভ করবে, এবং ফিলিপাইনসকে তার ফলে কমিউনিস্ট-প্রতিবেশীর সান্নিধ্যে ঘর করতে হবে, ব্যাপারটাকে তখন মোটেই মায়াকান্না বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রশ্ন হচ্ছে, মালয়েশিয়ায় সত্যিই কমিউনিস্টদের প্রাধান্য ঘটবে কিনা। সহজে ঘটবে এমন কথা ভাবা শক্ত। টুঙ্কুকে যাঁরা চেনেন, তাঁরা অন্তত সেই কথাই বলবেন।

ইন্দোনেশিয়ার আপত্তিকে কেন অগ্রাহ্য করেননি টুঙ্কু? করা তাঁর পক্ষে শক্ত ছিল। বাণিজ্যের ব্যাপারে মালয় আর ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ যোগ-সম্পর্ক রয়েছে, তাকে তিনি ক্ষুণ্ণ করতে চান না। দ্বিতীয়ত, তিনি হয়ত বিশ্বাস করেন যে, ইন্দোনেশিয়ার দাবিকে মেনে নিলেও কিছু ক্ষতি নেই; কেননা সারাবক আর উত্তর-বোর্নিওর রায় শেষ পর্যন্ত ফেডারেশনের অনুকূলেই যাবে।

সারাবক আর উত্তর-বোর্নিওর "রায় যদি মালয়েশিয়ার অনুকূলে যায়, তাহলে সেই রায় আমরা মাথা পেতে নেব।" সুকর্ণ বলেছিলেন। কিন্তু সারাবকে ইতিমধ্যেই অশান্তির আগুনে জ্বলে উঠেছে, এবং এর পিছনে যে ইন্দোনেশিয়ার উস্কানি আছে এমন ধারণা হয়ত অমূলক নয়। আবার প্রশ্ন উঠবে, সারাবক আর উত্তর-বোর্নিওর মানুষরা যদি সত্যিই মালয়েশিয়ায় যোগ দিতে চায়, তাহলে এইভাবে—ইতস্তত হাঙ্গামা বাধিয়ে—সেই ইচ্ছাকে বাধা দেওয়া যাবে কিনা। সম্ভবত যাবে না। উত্তর-বোর্নিওর ইন্দোদেশীয় দূতাবাসের

দেয়ালে ইতিমধ্যেই পোস্টার পড়েছে, "সুকর্ণকে চাই না, টুঙ্কুকে চাই।" এবং, সারাবকের আইনসভায়, মালয়েশিয়ায় যোগদানের সিদ্ধান্ত সম্প্রতি ৩১-৫ ভোটে অনুমোদিত হয়েছে। সারাবকের মানুষেরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে যে, সুকর্ণের পথের পথিক হলে শুধু বড় বড় লেকচারই শোনা যাবে, তার বেশী আর কিছুই পাওয়া যাবে না।

তার বেশী আর কী চায় তারা? শিক্ষা চায়, সাচ্ছল্য চায়, জীবনমানের উন্নতি চায়। মালয়েশিয়া আজ অনেকের কাছেই সেই আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে উঠেছে। ম্যাপের দিকে তাকিয়ে এই ফেডারেশনের অঙ্গরাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটা যোগরেখা কল্পনা করে নিলে মালয়েশিয়াকে প্রায় অর্ধচন্দ্রের মত দেখায়। এই প্রতীকটা আজ অনেকের মনেই এক সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন জাগিয়ে তুলেছে। কিন্তু 'হুয়াচিয়াও'দের মধ্যে যারা লালচীনের অনুরাগী, তারা জানে যে, এই অর্ধচন্দ্রের প্রতীক তাদের পক্ষে শুভ নয়।

ভিয়েতনামের নূরজাহান

"For many years she wielded the imperial power. She even gave audiences at her palace, and her name was placed on the coinage." (V. Smith. The Oxford History of India.)

মাদাম নু-র কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ নূরজাহানের তুলনা টেনেছি। অকারণে টানিনি। মাদাম নু রানী নন, এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের কারেন্সি নোটে তাঁর নাম আজও ছাপা হয়নি; কিন্তু তাঁর ক্ষমতা সত্যিই সীমাহীন। মন্ত্রিবর্গ, এমন কী, প্রেসিডেন্টকেও তিনি নাকি অক্লেশে আদেশ দিয়ে থাকেন। ক্ষমতার খেলায় সেনাপতি মহব্বত খাঁ একদা নূরজাহানের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেননি। সে-খেলায় জেনারেল নুয়েন ভ্যান হিনেরও উৎসাহ নেহাত কম ছিল না। কিন্তু, প্রায় মহব্বত খাঁর মতই, তিনি দক্ষিণ ভিয়েতনামের এই নূরজাহানের কাছে পরাস্ত হয়েছেন।

নুয়েন ভ্যান হিন গর্ব করে বলে বেড়াতেন যে, আসল ক্ষমতা তাঁরই হাতে; ইচ্ছে করলেই তিনি দিয়েম-সরকারের পতন ঘটিয়ে দিতে পারেন। তারপর? তারপর যে কী হবে, সেটাও জানিয়ে দিতেন নুয়েন ভ্যান হিন। বলতেন যে, দিয়েম-পরিবারের সব্বাইকে তিনি নির্বাসন দেবেন। শুধু এক মাদাম নু-কে ছাড়া। "মাদাম নু-কে আমি আমার বাঁদী করে রাখব।"

কথাটা কানে গিয়েছিল মাদাম নু-র। অতঃপর সায়গনের এক পার্টিতে হঠাৎ নুয়েন ভ্যান হিনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে যায়। স্পষ্ট কথাটা জানিয়ে দিতে সেদিন মাদাম নু-র এতটুকু ভয় হয়নি। জেনারেল নুয়েন ভ্যান হিনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

বলেছিলেন, "দিয়েম-সরকারের পতন ঘটাবেন, এত বড় সাহস আপনার নেই। আর, হ্যাঁ, সরকারের পতন ঘটালেও আমাকে আপনি পাবেন না। তার আগেই আমার এই নখ দিয়ে আপনার গলাটা আমি চিরে ফেলব।"

দিয়েম-সরকারের পতন ঘটেনি ; এবং জেনারেল হিনকেই শেষ পর্যন্ত নির্বাসনে যেতে হয়েছিল।

যেমন সৈন্যদল, তেমনি বিন জুয়েন বাহিনীর দাপটও নেহাৎ কম ছিল না। রাজ্য জুড়ে তারা অবাধে অত্যাচার করে বেড়াত। সরকার তাদের শায়েস্তা করতে পারেননি ; না-পেরে 'সন্ধি' করতে চাইছিলেন। মাদাম নু-র সেটা ভাল ঠেকেনি। তিনি ভাবছিলেন, জনসাধারণকে এই অত্যাচারী বাহিনীর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করে তুলতে হবে। সেই সময়কার একটা ঘটনার কথা বলি। মাদাম নু যখন একদিন বিন জুয়েনের বিরুদ্ধে একটা গণ-বিক্ষোভের ব্যবস্থা করছেন, বিন জুয়েনের লোকেরা তখন হঠাৎ তাঁকে ঘিরে দাঁড়ায়। তাদের হাতের উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র দেখেও সেদিন এতটুকু ভয় পাননি মাদাম নু। বিদ্যুদ্বেগে তিনি তাঁর গাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, "সাহস থাকে তো আমাকে ধরো তোমরা।"

কেউ ধরতে পারেনি তাঁকে। চোখের পলক পড়বার আগেই, শত্রুব্যূহ ভেদ করে, তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন।

সাহসী মেয়ে, তাতে সন্দেহ কী। প্রশ্ন হচ্ছে, দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট নো দিন দিয়েমের এই ভ্রাতৃবধূটি যে-পরিমাণে সাহসী, সেই পরিমাণে বুদ্ধিমতী কি না। অনেকে বলবেন, যে-পরিমাণে বুদ্ধিমতী, তার চাইতে অনেক বেশী নিষ্ঠুর। এবং, আর-কেউ সায় না দিক, দক্ষিণ ভিয়েতনামের বৌদ্ধরা যে এ-কথায় সায় দেবেন, তাতে সন্দেহ নেই। তার কারণ, বৌদ্ধরা আজ সেই নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছেন।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের বৌদ্ধ-বিক্ষোভের কথা সবাই জানেন।

মাদাম নু-র ধারণা, অনায়াসেই এই বিক্ষোভ দমন করা যেতে পারে। আর-কিছু নয়, “তিন গুণ জোরে ওদের ঠ্যাঙাও।”

অথচ, শুনে অনেকেই বিস্মিত হবেন যে, ক্যাথলিক পরিবারের এই বধূটি আসলে বৌদ্ধ ঘরেরই মেয়ে।

ধনী, বনেদী, জমিদার-পরিবারে তাঁর জন্ম। হানয়ের যে-বাড়িতে তাঁর শৈশব কেটেছে, সেখানে দাসদাসীর অন্ত ছিল না। মুখের কথা খসবার আগেই তাঁর প্রার্থিত বস্তুটি তিনি পেয়ে যেতেন। আজকের মাদাম নু তখন ত্রান লে জুয়ান, বাংলা করলে অর্থ দাঁড়ায় ‘সুন্দরী বাসন্তিকা’। বসন্তদিবসের মতন সুন্দর সেই মেয়েটি কখনও ইস্কুলে যাননি। লেখাপড়া যা শেখবার, তা বাড়িতেই শিখেছেন। এবং শুধু লেখাপড়াই তিনি শেখেননি; সেইসঙ্গে আরও দু-একটা বিদ্যে তাঁকে শেখানো হয়েছিল ' যথা নাচ। হানয়ের ন্যাশনাল থিয়েটারে একদা তাঁর একক নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়েছে।

বিদেশের এক পত্রিকায় সম্প্রতি তাঁর জীবন-বৃত্তান্ত বেরিয়েছে। পড়ে জানা গেল, ‘বাসন্তিকা’ সুন্দরী ছিলেন বটে, কিন্তু সুখী ছিলেন না। দুঃখের কারণ তাঁর মা, যিনি কিনা তাঁকে কড়া শাসনে রাখতেন। সেই শাসনের শৃঙ্খল ভাঙবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন ত্রান লে জুয়ান। বনেদী বাড়ির জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করেছেন। সুযোগ মিলল ষোল বছর বয়সে; বুদ্ধিমান এক যুবার সঙ্গে যেদিন বাসন্তিকার দেখা হয়ে গেল।

কী ছিল বিধাতার মনে! দেখা হল, আর-কারও সঙ্গে নয়, নো দিন নু-র সঙ্গে। আজকে যিনি দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রেসিডেণ্ট, সেই নো দিন দিয়েম তখন মুক্তি-যুদ্ধের এক বিখ্যাত নায়ক। নো দিন নু তাঁরই ছোট ভাই। ইন্দো-চায়না লাইব্রেরিতে কাজ করতেন নু; এবং অবসর-সময়ে—ত্রাণ লে জুয়ানের টানে নয়—মাদাম চুয়ং অর্থাৎ বাসন্তিকার মায়ের সঙ্গে গল্প করবার জন্যে তাঁদের বাড়িতে যেতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা ভাল যে, ‘বাসন্তিকা’র মা-ও ছিলেন

নাম-করা সুন্দরী। মেয়েকে তিনি বলে দিয়েছিলেন, এই ভদ্রলোকটিকে "তুমি মামা বলে ডেকো।"

চুয়ংদের বাড়িতে যাবার সময়ে লাইব্রেরি থেকে কিছু বই নিয়ে যেতেন নু। এমন সব বই, তাঁর "ছোট্ট ভাগ্নীটি" যা পড়ে খুশী হতে পারে। তা ছাড়া নাকি "ভাগ্নী"টিকে তিনি লাতিনও শেখাতেন। কিন্তু শুধু বই পড়ে আর লাতিন শিখেই খুশী থাকেননি ত্রান লে জুয়ান। মায়ের শাসনের গণ্ডী থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন। নু-কে দেখে তাঁর মনে হল, "ইনি হয়ত আমাকে উদ্ধার করতে পারবেন"। বিয়ে তো করতেই হবে। সেক্ষেত্রে "এঁকেই বা নয় কেন?"

বর ক্যাথলিক; কনে বৌদ্ধ। বিয়ে হল ১৯৪৩ সনে। কনে গ্রহণ করলেন তাঁর স্বামীর ধর্ম। দিয়েম-পরিবারে ঢুকবার পর থেকে সেই ধর্মের জন্যে তিনি অক্লান্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। এমন সংগ্রাম যে, দক্ষিণ ভিয়েতমামের বৌদ্ধরা আজ তার ফলে ভয়বিহ্বল এবং ক্যাথলিকরাও হয়ত-বা খুব খুশী নন। বস্তুত, ভ্যাটিকানের কাগজে ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, অসহিষ্ণুতাকে সমর্থন করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। যিশুর যাঁরা সত্যিকারের উপাসক তাঁরা জানেন যে, দক্ষিণ ভিয়েতনামের বৌদ্ধ-সমাজের উপর আজ যে অত্যাচার চলেছে, ক্যাথলিকদের সুনাম তাতে বাড়বে না।

মাদাম নু এদিকে বৌদ্ধদের দাবির সামনে এক ইঞ্চি নতি স্বীকারেও রাজী নন। বৌদ্ধদের বিক্ষোভ তাঁর মতে রাষ্ট্রদোহ, "অ্যান ইগ্‌নোব্‌ল ফর্ম অব ট্রীজ্‌ন।" তিনি বলেন, এই বিক্ষোভের পিছনে আসলে কমিউনিস্টদের হাত রয়েছে।

কমিউনিস্টদের হাতে একবার বন্দীও হয়েছিলেন মাদাম নু। কিন্তু সে-কথা বলবার আগে বরং সংক্ষেপে তাঁর স্বামী, ভাশুর আর দেওরদের, অর্থাৎ নো দিন-ব্রাদার্সে'র পরিচয় দেওয়া যাক।

প্রেসিডেন্ট নো দিন দিয়েমের পরিচয় সকলেই জানেন।

নো দিন থুক্ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বয়স ছেষট্টি; হয়েছে তিনি রোমান ক্যাথলিক আর্চবিশপ। অনুজ দিয়েমের মন্ত্রিসভায় তিনি তাঁর জনকয়েক অনুগ্রহভাজনকে নাকি ঢুকিয়ে দিয়েছেন। ভ্যাটিকানে বারবার অনুরোধ গিয়েছে, আর্চবিশপ থুককে এবারে কার্ডিনালের পদে উন্নীত করা হোক; কিন্তু এই অনুরোধে আজও কর্ণপাত করা হয়নি। নো দিন পরিবারে থুকই বোধহয় একমাত্র মানুষ, মাদাম নু যাঁর সমালোচনা করেন না।

নো দিন নু-র বয়স এখন বাহান্ন। মাদাম নুর স্বামী। দাদা দিয়েমের রাজনৈতিক উপদেষ্টা। প্রাসাদের মধ্যেই তাঁর অফিস। সেইখানে বসে গোয়েন্দা পুলিসের কর্মসূচী রচনা করেন। ভয়ঙ্কর এই পুলিস-বাহিনীর তিনি সর্বময় কর্তা। আর্মিতেও কাকে কখন প্রোমোশন দেওয়া হবে, নু-র পরামর্শ ছাড়া তা স্থির করবার উপায় নেই। অসামরিক সরকারী চাকরির বিলি-বণ্টনেও তাঁর সুপারিশের মূল্য নেহাত কম নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারেও তিনি অগ্রজকে উপদেশ দিয়ে থাকেন। তা ছাড়া আছে তাঁর নিজের দল: রেভলিউশনারি লেবার পার্টি। যার সদস্য-সংখ্যা কম নয়, এবং দুর্নাম বড় বেশী। শোনা যায়, এই দলটির আসল কাজ আর কিছুই নয়, গুপ্তচরবৃত্তি। কোনও ব্যাপারে কেউ একটু বেচাল হলেই নাকি এদের মারফতে অমনি পুলিসের কাছে খবর পৌঁছে যায়।

নো দিন ক্যানের বয়স পঞ্চাশ। নো দিন ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে একমাত্র ইনি আজও বিদেশে যাননি। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়া থেকেও ইনি সর্বদা একটু দূরে থেকেছেন। তবে শক্ত মানুষ হিসেবে এঁর খ্যাতি নেহাত অল্প নয়। মধ্যাঞ্চলের ইনি শাসনকর্তা, এবং যুদ্ধটা সেখানে ভালই চলছে। মাদাম নু যে এঁর প্রতি বিশেষ প্রসন্ন এমন কথা বলা যায় না। তবে তিনি এই দেবরটির কর্মকুশলতার তারিফ করে থাকেন।

ক্যানের পরে নো দিন লুয়েন। বয়স আটচল্লিশ। দক্ষিণ

ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত হিসেবে গ্রেট ব্রিটেনে আছেন। মাদাম নু-র বিবেচনায় তাঁর এই কনিষ্ঠ দেবরটি নেহাতই অপদার্থ।

নো দিন পরিবারে কার সম্পর্কে শ্রীমতী নু-র ধারণা কী রকম, নিতান্ত এই কারণে তার আভাস দিতে হল যে, তাঁর মতামতের মূল্য এ-ব্যাপারে অনেকখানি। তাঁরই ইঙ্গিতে কারও বা উন্নতি হতে পারে, কারও বা অবনতি। প্রেসিডেন্ট দিয়েমও নাকি পারতপক্ষে তাঁর মতের বিরুদ্ধে যেতে চান না।

বলা বাহুল্য, রাতারাতি এই শাসক-পরিবারের তিনি সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে ওঠেননি। একটু-একটু করে তাঁকে ক্ষমতা দখল করতে হয়েছে, একটির-পর-একটি বিঘ্ন পেরিয়ে আসতে হয়েছে। জাতীয় পরিষদের তিনি ডেপুটি; নারী-আন্দোলনের তিনি নেত্রী। কিন্তু তাঁর আসল পরিচয় এই যে, নো দিন পরিবারের তিনি মক্ষীরানী। লোকে জানে, যদি ইচ্ছে হয় ত প্রেসিডেন্ট দিয়েমের সিদ্ধান্তকেও তিনি পালটে দিতে পারেন। তা যে কখনও দেননি, এমনও নয়। এতখানি ক্ষমতা কি আর একদিনে পেয়েছেন তিনি? তা নিশ্চয়ই পাননি। বিস্তর উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে তাঁকে এগিয়ে আসতে হয়েছে। মাদাম নু আজ অনেকেরই পথের কাঁটা। কিন্তু তাঁর নিজের পথও কুসুমে আস্তীর্ণ ছিল না।

বিয়ের মাত্র তিন বছর পরেই বেধেছিল যুদ্ধ। ইন্দোচীনের সেই মর্মক্ষয়ী যুদ্ধের কথা আশা করি অনেকেরই মনে আছে। নো দিন ভাইদের তখন এক দ্বিমুখী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়েছিল। একদিকে তাঁরা কমিউনিস্ট 'মুক্তিফৌজের' বিরোধিতা করেছেন; অন্যদিকে ফরাসীদের হাতের পুতুল বাও দাইয়ের। আর্চবিশপ নো দিন থুকই এখন বড় ভাই। কিন্তু তাঁরও একজন অগ্রজ ছিলেন। হুয়েতে ঢুকে কমিউনিস্ট 'মুক্তিফৌজ' তাঁকে হত্যা করে। তাঁর একমাত্র সন্তানও সেদিন কমিউনিস্টদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিল। দিয়েমকেও তারা তখন মাস কয়েকের জন্য বন্দী করে রাখে। নু আর ক্যান অব

কমিউনিস্টদের কবল থেকে পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। কিন্তু মাদাম নু পারেননি। ১৯৪৬ সনের ডিসেম্বর মাসে তিনি, তাঁর শিশু-কন্যা আর শ্বশ্রুমাতা একদিন কমিউনিস্টদের হাতে বন্দী হন।

মুক্তি পাওয়া গেল চার মাস পরে। কিন্তু এই চার মাসের মধ্যেই কমিউনিস্টদের যে পরিচয় পেয়েছিলেন মাদাম নু, চিরকালই তা হয়ত তাঁকে কমিউনিস্ট-বিরোধী করে রাখবে। কমিউনিস্টদের প্রসঙ্গ উঠলে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, ওদের "আমি সহ্য করতে পারি না।"

যুদ্ধ চলেছিল আট বছর। এই আট বছরে নো দিন পরিবারকে অশেষ কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। দিয়েমকে নির্বাসনে যেতে হয়েছিল। নু আর তাঁর স্ত্রী নিয়েছিলেন জন-সংগঠনের কাজ। ছোট্ট একটা কাগজ বার করতেন তাঁরা। তাতে স্পষ্ট করে বলা হত যে, দিয়েম ছাড়া ভিয়েতনামের ভবিষ্যৎ নেই। ভিয়েতনামকে যদি সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে হয়, তাহলে দিয়েমকে আবার স্বদেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। নু-দম্পতির সেই সংগ্রামের দিনগুলি বড় কষ্টে কেটেছে। কষ্ট হত না, মাদাম নু যদি তাঁর বাবার কাছ থেকে টাকা দিতেন। বাবা যে টাকা দিতে চাননি, এমনও নয়। বারবার তিনি মেয়েকে সাহায্য করতে চেয়েছেন। কিন্তু মেয়ে বড় জেদী। স্বামীর সংসারে তিনি দুঃখ ভোগ করেছেন, নিজের হাতে বাজার-হাট করেছেন, সাইকেলে চেপে শহরে-গ্রামে টহল দিয়ে বেরিয়েছেন, কিন্তু বাবার কাছ থেকে তিনি এক পয়সাও নেননি।

(নূরজাহানের সঙ্গে মাদাম নু-র মিলের কথা বলেছি। অমিল আরও বেশী। অন্তত, পিতার প্রতি অনুরাগের ব্যাপারে, এই দুই নারীর মধ্যে বিন্দুমাত্র মিল নেই। নূরজাহানের পিতা, কন্যার দৌলতে, একদিন জামাতা-জাহাঙ্গীরের দরবারে বিপুল প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। মাদাম নু-র পিতৃভক্তি এত প্রবল নয়। তাঁর বাবা ত্রান ভ্যান চুয়ং এই সেদিনও ছিলেন ওয়াশিংটনে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের

রাষ্ট্রদূত। কন্যার বৌদ্ধ-নিগ্রহ-নীতির সমালোচনা করায় তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়েছে।)

পরের ইতিহাস সকলেই জানেন। দিয়েন বিয়েন ফুতে বিপর্যয় ঘটল ফরাসীদের। নির্বাসিত দিয়েমের দাবি তাঁরা মেনে নিলেন। ভিয়েতনাম স্বাধীনতা পেল। দিয়েম স্বদেশে ফিরলেন। দেশ বিভাগ হল। দক্ষিণ ভিয়েতনামের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিলেন নো দিন দিয়েম।

বড় দুরূহ দায়িত্ব। তার কারণ, দেশে তখন শৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই। সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল নুয়েন ভ্যান হিনের মাথায় এদিকে নানা রকমের মতলব খেলছিল। প্রকাশ্যেই তিনি হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন যে, দিয়েমকে তিনি দূর করবেন। বিন জুয়েন বাহিনীও অবাধে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিল। আর, এই সমস্ত লক্ষণ দেখে অনেকেরই মনে হয়েছিল যে, দক্ষিণ ভিয়েতনামের শাসনব্যবস্থা হয়ত তাসের ঘরের মতই ভেঙে পড়বে।

পড়েনি। দিয়েমের হাত ক্রমে আরও শক্ত হয়েছে। ক্ষমতার খেলায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা একে-একে পরাস্ত হয়েছে। কমিউনিস্টদের অগ্রগতি রোধের কাজও যে সফল না হয়েছে, এমন নয়। এ-কাজে তাঁর প্রধান সহায় নো দিন নু। কমিউনিস্ট-বিরোধী ঘাঁটি হিসেবে বারো হাজার গ্রাম গঠনের এক পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। তার মধ্যে সাত-আট হাজার গ্রাম ইতিমধ্যেই গড়া হয়েছে। সর্বোপরি, প্রেসিডেন্ট দিয়েমকে প্রেরণা দেবার জন্যে আছেন তাঁর ভ্রাতৃবধূ, অর্থাৎ মাদাম নু, অর্থাৎ সেই অগ্নিবর্ষী মহিলা, কমিউনিস্টদের যিনি কিনা আদপেই "সহ্য করতে" পারেন না।

দিয়েমের দিনগুলি অতএব মোটামুটি শান্তিতেই কাটতে পারত। কাটছে না, তার কারণ, মাদাম নু যে শুধু কমিউনিস্টদেরই "সহ্য করতে" পারেন না, তা নয়; বৌদ্ধরাও তাঁর চোখের বালি।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনসংখ্যার শতকরা প্রায় আশি ভাগই বৌদ্ধ।

দশ ভাগ ক্যাথলিক। বাকি দশ ভাগ অন্য-কিছু। কিন্তু বৌদ্ধদের অভিযোগ, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও তাঁরা, প্রাধান্য দূরে থাক, সমান সুযোগ-সুবিধে পাচ্ছেন না। প্রাধান্য ঘটছে ক্যাথলিকদের। সংখ্যার বিচারে তাঁরা এক-দশমাংশ মাত্র; কিন্তু রাষ্ট্রকর্তারা যেহেতু ক্যাথলিক, তাই সংখ্যালঘু হয়েও তাঁরা সামরিক আর অসামরিক চাকরিগুলিতে পটাপট ঢুকছেন, এবং বৌদ্ধদের ডিঙিয়ে রাতারাতি প্রোমোশন পেয়ে যাচ্ছেন। চাকরি আর প্রোমোশনের টানে যে কিছু বৌদ্ধ অতঃপর ধর্মান্তর গ্রহণ করবেন, বুদ্ধকে ছেড়ে যিশুর শরণ নেবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বস্তুত, ইতিমধ্যেই অনেকে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তাঁরা আস্থা হারাননি; কিন্তু—প্রোমোশনে পাছে বিঘ্ন ঘটে, তাই—প্যাগোডার বদলে তাঁরা গির্জায় গিয়ে উপাসনায় যোগ দিচ্ছেন। বৌদ্ধদের এই অভিযোগ যে একেবারে ভিত্তিহীন, এমন কথা কেউ বলতে পারে না।

অভিযোগ ভিত্তিহীন নয়। সব চাইতে বড় অভিযোগ, বৌদ্ধ-সমাজের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা আজ বিপন্ন হয়েছে।

অসন্তোষ আর চাপা বিক্ষোভ গত কয়েক মাস ধরেই ধূমায়িত হচ্ছিল। তারপর হঠাৎ একদিন হুয়ে শহরে আগুন জ্বলে উঠল। গুলি চলল, অনেকে হতাহতও হলেন। কিন্তু গুলি চালিয়ে যে আগুন নেবানো যায় না, দিয়েম-সরকার এই সহজ কথাটাই হয়ত বুঝতে পারেননি। সায়গনের রাজপথের উপরে, গায়ে পেট্রোল ছড়িয়ে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কোয়াং ডাক যখন আগুনে আত্মাহুতি দিলেন, তখনও না।

সে-আগুন ক্রমেই আরও ব্যাপক হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। দিয়েম-সরকারের অত্যাচারের প্রতিবাদে, কোয়াং ডাকের পরেও, তিনজন ভিক্ষু আর একজন ভিক্ষুণী আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছেন। এবং সমগ্র পৃথিবী আজ জেনে গিয়েছে যে, দক্ষিণ ভিয়েতনামের বৌদ্ধ-সমাজের

দাবি মোটেই অসঙ্গত নয়। বৌদ্ধ-সমাজের দাবি : ছয়ের ঘটনার ক্ষতিপূরণ চাই। সরকারী পক্ষপাতিত্বের অবসান চাই। ধর্মাচরণের ব্যাপারে স্বাধীনতা চাই।

দাবি না-মেটালে বিক্ষোভ যে হঠাৎ বিদ্রোহে রূপান্তরিত হতে পারে, এমন আশঙ্কাও অমূলক নয়। এদিকে এই নিবন্ধ রচনা শেষ হবার আগেই খবর পাওয়া গেল, "সমগ্র দক্ষিণ ভিয়েতনামে সামরিক আইন জারী হইয়াছে। প্রতিটি প্যাগোডায় শত-শত পুলিস ও সৈন্য হানা দিয়া তছনছ করিয়াছে। গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি দখল করিয়া লইয়াছে। তাহারা এখন যে-কোন সময় যে-কোন বাড়িতে তল্লাসি চালাইতে পারিবে, যাহাকে হউক যতজনকে হউক পাকড়াও করিতে পারিবে।"

বলা বাহুল্য, এটা আর যাই হক, দাবি মেটাবার উদ্যোগ নয়। সে-উদ্যোগ দিয়েম হয়ত বা দেখাতেও পারতেন। কিন্তু ভ্রাতা নু আর ভ্রাতৃবধূ যে তাঁকে বৌদ্ধদের প্রতি বিন্দুমাত্র উদার হতে দেবেন, এমন মনে হয় না। কে জানে, উদার হবার চেষ্টা করলে তাঁকে হয়ত ক্ষমতার আসন থেকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ত নিজের থেকেই সরে দাঁড়িয়েছেন। মাদাম নু তবু অবিচল।

বৌদ্ধরা যে আগুনে আত্মাহুতি দিচ্ছেন, এই খবরে নাকি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি মাদাম নু। তিনি নাকি বলেছিলেন, ওরা যত জনকেই পুড়িয়ে মারুক, "আমরা হাততালি দেব।" প্রশ্ন হচ্ছে, সংখ্যায় যারা শতকরা আশি, নিজের শরীরে আগুন না-জ্বালিয়ে তারা যদি ব্যাপক বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তোলে? মাদাম নু কি তখনও হাততালি দিতে পারবেন?

প্রশ্নটা জরুরী। এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে যে-সব খবর আসছে, তাতে মনে হয়, উত্তর পেতেও দেরি হবে না।

একজন 'আমুদে' ডাক্তার এবং অনেকগুলি 'শকুন'

"এই আতঙ্ক আর আমি সইতে পারছি না।...ওরা আমাকে মারতে চায়; কিন্তু ওদের হাতে মরবার ইচ্ছা আমার নেই। তার চাইতে বরং নিজের হাতেই নিজেকে আমি মারব।...আমার যা করবার আমি করেছিলাম। কিন্তু মার্শালের কথা শুনবার পরে আর কোনও আশা নেই আমার। প্রসঙ্গত বলি, কাজটা যে এত সহজ হবে, তা আমি ভাবিনি।...শকুনগুলোকে আমি হতাশ করলুম। তার জন্যে আমি দুঃখিত।"

"কেন যে তুমি এ-কাজ করলে, আমি জানি না। কারা যে তোমাকে এমন কথা বলতে বাধ্য করল, তা-ও না। কিন্তু, একবিন্দু সম্ভ্রম যদি তোমার থাকে, তাহলে—রনা রিকোর্ডোর মতন—তোমারও এখন সত্য কথাটা সবাইকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। আমার কথা ভেবে নয়, ভবিষ্যতে যারা তোমার কিংবা আমার মতো অবস্থায় পড়তে পারে, তাদের সকলের কথা ভেবেই তোমার সত্য কথা বলা উচিত।"

ঘুমের বড়ি খাবার পরে মোট তেরখানি চিঠি লিখেছিলেন ডঃ স্টীফেন ওয়ার্ড। তার মধ্যে দুখানি চিঠির দুটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করেছি। একটি তাঁর বন্ধুকে লেখা; অন্যটি শত্রুকে। অথচ ভিকি ব্যারেট নাম্নী সেই পণ্যা মেয়েটি, ওল্ড বেইলির মামলায় যার সাক্ষ্য সেদিন মৃত্যুবাণের কাজ করেছে, সত্যিই সে কিন্তু ওয়ার্ডের শত্রু ছিল না। তা হলে সে কেন ওয়ার্ডের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিল? মৃত্যুপথযাত্রীর চিঠিখানাকে তার হাতে তুলে দেবার পরে নাকি

কেঁদে ফেলেছিল ভিকি। বলেছিল, ওয়ার্ডের বিরুদ্ধে সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে।

"আমি চাইনি যে, তাঁর মৃত্যু হোক। এর জন্যে যে তিনি আত্মহত্যা করবেন, তা আমি বুঝতে পারিনি। আমি মিথ্যে বলেছিলাম ; হ্যাঁ, আমি মিথ্যে বলেছিলাম।"

ভিকি অবশ্য পরে এ-কথার প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু কোন্‌টা যে সত্যি, স্বীকারোক্তিটা, না তার প্রতিবাদ, বলা কঠিন। কে জানে, আদালতে দাঁড়িয়ে ভিকি ব্যারেট হয়ত মিথ্যা সাক্ষ্যই দিয়েছিল, কিন্তু সে-কথা স্বীকার করবার পরে হয়ত আবার ভয় দেখানো হয়েছে তাকে, আর ভিকিও তাই হয়ত মিথ্যাটাকেই আবার আঁকড়ে ধরেছে।

ভয় দেখানো হয়েছিল রনা রিকার্ডোকেও। প্রাথমিক শুনানীর সময় সে তাই মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল। সেই মিথ্যা সাক্ষ্যকে সে পরে প্রত্যাহার করে নেয়। প্রশ্ন হচ্ছে, মিথ্যা সাক্ষ্য আদায় করবার জন্যে যারা ভয় দেখায়, তারা কারা? পুলিস? কিন্তু পুলিসের এতে স্বার্থ কী? স্বার্থ তাঁদের, সমাজে যাঁরা মান্য মানুষ, কিন্তু যাঁদের জীবন হয়ত নিষ্কলঙ্ক নয়। তাঁরা হয়ত ভেবেছিলেন যে, ওয়ার্ডের কফিনে বেশ ভাল করে পেরেক না-ঠুকলে তাঁরা নিজেরাই মারা পড়বেন। ভিকি ব্যারেট আর রনা রিকার্ডোকে দিয়ে কি তাঁরা ওয়ার্ডের কফিনে পেরেক ঠুকিয়ে নিতে চেয়েছিলেন? বিচিত্র নয়। কিন্তু ওয়ার্ড মারা গেছেন বলেই যে তাঁরা নিষ্কণ্টক, এমন কথা এখনই বলা যাচ্ছে না।

জুলি গালিভারের কথা শুনে অন্তত সেই রকমই মনে হতে পারে। ডঃ স্টীফেন ওয়ার্ডের শেষ বান্ধবী জুলি গালিভার। তিনি বলেছেন, "স্টীফেনকে যারা সাহায্য করতে পারত, তারা এগিয়ে আসেনি। তারা এখনও হাসছে। সেই হাসিটা যাতে মুছে যায়, তার ব্যবস্থা আমি করব।"

কে সাহায্য করতে পারত ডঃ ওয়ার্ডকে? জুয়াড়ী জো ওয়েড বলছে, সে পারত। "ডঃ ওয়ার্ডকে আমি সাহায্য করতে পারতুম। কিন্তু আমি কাপুরুষ। তাই সময় থাকতে আমি এগিয়ে আসিনি। সারা জীবন তার জন্যে আমাকে মনস্তাপ ভোগ করতে হবে।"

বলা বাহুল্য, জো ওয়েড একটি চুনোপুঁটি। কিন্তু, নিজে চুনোপুঁটি হলেও, জনাকয়েক রাঘব-বোয়ালের সন্ধান সে হয়ত দিতে পারে। রাঘব-বোয়ালদের পক্ষে অতএব এই মুহূর্তেই নিশ্চিন্ত হওয়া সম্ভব নয়, এবং এই মুহূর্তেই কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে, কার্নেশন আর লাল-গোলাপে পরিবৃত যে মানুষটি সেদিন সেণ্ট স্টীফেন হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই ওয়ার্ড-নাট্যের উপরে যবনিকা পড়ল।

যবনিকা উঠেছিল কয়েক মাস আগে। এবং তারও আগে শুরু হয়েছিল কানাকানি। ক্রিস্টিন কীলারের প্রাক্তন প্রেমিক জনি এজকোম্বের বিরুদ্ধে যেদিন মামলা ওঠে, এবং মামলা উঠবার পরে যখন দেখা যায় যে, কীলারকে এনে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়নি, সে নিরুদ্দেশ, তখনই সবাই বুঝতে পারে যে, ব্যাপারটা একটু রহস্যময়। অনুমান করে, কিছু বৃহৎ ব্যক্তিও এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। তাঁরা হয়ত আশঙ্কা করছেন, সাক্ষ্য দিতে গিয়ে, জেরায়-জেরায় জেরবার হয়ে, ক্রিস্টিন হয়ত বহু বেফাঁস কথা বলে বসবে। বৃহৎ ব্যক্তিদের পরিচয় তখন আর গোপন থাকবে না। কে জানে, কেঁচো খুড়তে গিয়ে হয়ত সাপ বেরিয়ে পড়বে। আর সেই জন্যেই হয়ত ক্রিস্টিন কীলারকে সরিয়ে দিয়েছেন তাঁরা।

তাঁরা কারা? ইংল্যাণ্ডে এ নিয়ে কানাকানি চলছিল, কিন্তু তখনও কেউ প্রকাশ্যে কিছু বলেনি। প্রথমে বলল বিদেশের একটি পত্রিকা। অভিযোগ করল যে, ব্রিটিশ সরকারের সমর-মন্ত্রী

প্রোফুমোর সঙ্গে পণ্যা নারী কীলারের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। প্রোফুমো তাঁদের নামে মানহানির মামলা আনলেন: মামলায় জিতে খেসারতও আদায় করলেন তিনি।

কিন্তু কানাকানি তবু বন্ধ হল না। এবং পার্লামেন্টেও অভিযোগ উঠল। প্রোফুমো বললেন, অভিযোগ ভিত্তিহীন। কীলারকে এবং তাঁর বন্ধু ক্যাপ্টেন আইভানভকে তিনি চেনেন বটে, কিন্তু কীলারের সঙ্গে তিনি এমন কোনও সম্পর্ক স্থাপন করেননি, যা নিয়ে আপত্তি উঠতে পারে। শুধু এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি তিনি। বলেছিলেন, পার্লামেন্টের বাইরে যদি কেউ কীলারের সঙ্গে তাঁর 'অবৈধ' সম্পর্কের অভিযোগ তোলে, তাহলে তার বিরুদ্ধে তিনি মানহানির মামলা করবেন।

ঠিক এই সময়েই এগিয়ে এসেছিলেন ডঃ স্টীফেন ওয়ার্ড। লোকে জানত, কীলার তাঁর আশ্রিত। কথাটা মিথ্যাও নয়। সুতরাং ওয়ার্ড যদি এক্ষেত্রে মুখ বুঁজে থাকতেন, তাহলে কেউ বিস্মিত হত না। কিন্তু ওয়ার্ড সেদিন মুখ বুজে থাকেননি। কে জানে, সোভিয়েট কূটনীতিক আইভানভ যে কীলারের মাধ্যমে প্রোফুমোর কাছ থেকে কিছু গোপনীয় সামরিক তথ্য জেনে নেবার চেষ্টা করেছিলেন, ওয়ার্ড তা হয়ত প্রথমে জানতেন না, এবং জানবার পরে হয়ত তিনি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করে থাকবেন। কিংবা এমনও বিচিত্র নয় যে, অন্য-কোনও গূঢ় কারণে তিনি মুখ খুলেছিলেন। তবে, কারণটা যা-ই হোক, অন্তত এই একটা ব্যাপারে তিনি সত্যকে চাপা দেননি। হোম সেক্রেটারি হেনরি ব্রুকের কাছে একখানি চিঠি লিখে, বেশ স্পষ্ট করেই তিনি জানিয়েছিলেন যে, প্রোফুমোর কথা সত্য নয়।

পরবর্তী ইতিহাস সকলেই জানেন। ব্রিটিশ সরকারের সমর-মন্ত্রী স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, পার্লামেন্টে তিনি মিথ্যা কথা বলেছেন। স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, কীলারের সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্কের কথাটা মোটেই ভিত্তিহীন নয়। মন্ত্রিসভা থেকে—

শুধুই মন্ত্রিসভা থেকে কেন, পার্লামেণ্ট থেকেও—বিদায় নিলেন তিনি। এবং গোটা ব্যাপারটা নিয়ে এমন-একটা প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হল যে, মনে হল, ম্যাকমিলান-সরকারেরও পতন হয়ত অনিবার্য।

ঠিক তার পরেই গ্রেপ্তার করা হল ডঃ ওয়ার্ডকে।

কীলার-কেলেঙ্কারির আগে কে চিনত ডঃ ওয়ার্ডকে? ইংল্যাণ্ডের বাইরে বিশেষ কেউ চিনত না; এবং ইংল্যাণ্ডেও শুধু উঁচু-মহলের কিছু মানুষই তাঁকে চিনত। তারা জানত যে, এই অস্থিবিদ্যাবিশারদের স্বভাবটি বেশ 'আমুদে'; জানত যে, অন্ধকারের ভিতর থেকে সুন্দরী মেয়েদের জুটিয়ে এনে তাদের শিখিয়ে-পড়িয়ে তালিম দিয়ে উঁচু-মহলে ভিড়িয়ে দিয়ে তিনি খুব আনন্দ পান; জানত যে, তাঁর নীতিবোধ খুব প্রবল নয়; আর জানত যে, তিনি একজন দক্ষ শিল্পী। উঁচু-মহলে কার না পোর্ট্রেট এঁকেছেন ওয়ার্ড? সোফিয়া লোরেনের এঁকেছেন; ডানকান স্যাণ্ডসের এঁকেছেন; প্রিন্স ফিলিপেরও এঁকেছেন। কিন্তু উঁচু-মহলের বাইরে কে তাঁকে চিনত? কেউ না। অথচ, গতকল্য-অখ্যাত সেই মানুষটিকে আজ সবাই চেনে। রাতারাতি তিনি বিখ্যাত (নাকি কুখ্যাত?) হয়েছেন। এমন কোনও কাগজ বোধ হয় কোথাও নেই, লণ্ডনের এই সোসাইটি-অস্টিওপ্যাথের নাম যার হেডলাইনে স্থান পায়নি।

ডঃ ওয়ার্ড বড় ঘরের ছেলে। তাঁর বাবা ছিলেন অক্সফোর্ডের ছাত্র। নামকরা ছাত্র। 'আধুনিক ইতিহাস'-এ প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছিলেন তিনি। পরে তিনি ধর্মযাজক হন। পুত্র স্টীফেনের শিক্ষা-ব্যবস্থায় তিনি ত্রুটি রাখেননি। ইংল্যাণ্ডের পড়া চুকিয়ে স্টীফেন যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে তিনি ছিলেন কার্কসভিলের 'কলেজ অব অস্টিওপ্যাথি'র ছাত্র। সেই কলেজের এক শিক্ষক জানিয়েছেন যে, ক্লাস-রুমেও "স্টীফেন অনেক সময় ছবি আঁকত।" যাই হোক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ডিগ্রী নিয়ে আবার ইংল্যাণ্ডে ফিরে

আসেন স্টীফেন ওয়ার্ড ; প্র্যাকটিস শুরু করেন। প্রথম দিকে তাঁর প্র্যাকটিস বিশেষ জমেনি। তার বছর কয়েক বাদেই বাধল যুদ্ধ। যুদ্ধে নাম লিখিয়ে তিনি ভারতবর্ষে এলেন।

ভারতবর্ষ থেকে ইংল্যাণ্ডে ফিরে গিয়ে তিনি এক ফ্যাশন-মডেলকে বিয়ে করেন। সে-বিয়ে ধোপে টেঁকেনি ; পরের বছরেই বিচ্ছেদ ঘটল। সেই যে বিচ্ছেদ ঘটল, ডঃ স্টীফেন ওয়ার্ড তারপরে আর বিয়ে করেননি। কিন্তু তার অর্থ অবশ্যই এই নয় যে, নারীর সান্নিধ্যে তাঁর আর স্পৃহা ছিল না। স্পৃহা ছিল। তাই একটির-পর-একটি নারী এসেছে তাঁর জীবনে। অন্ধকার থেকে তিনি তাদের কুড়িয়ে এনেছেন ; তাদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন ফুর্তি আর আমোদের এক অদ্ভুত মধুচক্র।

নারী ছিল। বন্ধুও ছিল। কে জানে, নারী ছিল বলেই হয়ত বন্ধু সংগ্রহের কাজটা বিশেষ কঠিন হয়নি। এবং, বলাই বাহুল্য, তাঁরা কেউ হেঁজিপেঁজি মানুষ নন। সমাজের তাঁরা শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। বিত্তবান, খ্যাতিমান, ক্ষমতাশালী মানুষ তাঁরা। ডঃ ওয়ার্ডের মধুচক্রটিকে তাঁরা বেশ জমিয়ে রেখেছিলেন।

সুতরাং, প্র্যাকটিসও বেশ জমে উঠছিল। তবে কিনা, প্র্যাকটিস জমলেও সম্ভবত টাকা বিশেষ জমছিল না। তা নিয়ে অবশ্য বিশেষ উদ্বেগ ছিল না ওয়ার্ডের। 'ম্যাণ্ডি' অর্থাৎ মেরিলিন রাইস-ডেভিস নাম্নী সেই মেয়েটিকে নাকি তা তিনি জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "এবারে আমরা বিয়ে করলেই পারি।" সংসার পেতে বসলে খরচ বাড়বে ? বাড়ুক। খরচ অবশ্য বিয়ে না-করা সত্ত্বেও বেড়ে গিয়েছিল। তা টাকার জন্যে ভাবনা ছিল না ওয়ার্ডের। কেননা, "বিল্ তো আছেই।"

'বিল্' আর কেউ নন, লর্ড অ্যাস্টর।

ওয়ার্ডের আশা ছিল, দুর্দিন যদি আসেই, তাঁর বন্ধুরা তাঁকে দেখবেন। তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবেন।

দুর্দিন যখন এল, তখন সেই বন্ধুদের মধ্যে—নিতান্ত দু-একজন ছাড়া—কেউ-ই তাঁকে দেখেননি ; তাঁর পাশে এসে দাঁড়াননি। এমন কী, জো ওয়েড নামক সেই জুয়াড়ী, যে এখন বলছে, "আই হ্যাভ বিন এ কাওয়ার্ড নট টু হ্যাভ কাম ফরওয়ার্ড," সেও তখন গা-ঢাকা দিয়ে ছিল। পরে অবশ্য সে ওয়ার্ডের সলিসিটরের সঙ্গে দেখা করে ; বলে যে, এমন-কিছু প্রমাণ আছে তার হাতে, ওয়ার্ডের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যার ফলে ধসে পড়বে। কিন্তু তখন আর সময় নেই। আপিলের মামলায় সাক্ষ্য দিতে চেয়েছিল ওয়েড ; কিন্তু আপিলের সময় যে নূতন সাক্ষী ডাকবার নিয়ম নেই, সে তা জানত না।

ওয়ার্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল, গণিকার উপার্জিত অর্থে তিনি জীবনধারণ করেন। ক্রিস্টিন কীলার তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে ; ম্যাণ্ডির সাক্ষ্যও তাঁর অনুকূলে যায়নি। প্রসঙ্গত অনেক বৃহৎ ব্যক্তির নাম প্রকাশ করেছে তারা। লর্ড অ্যাস্টরের নাম। ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কসের নাম। লণ্ডনের গোপন-জীবনের এমন একটি চিত্র তারা ফুটিয়ে তুলেছিল, যা চমকে দেবার মতো। ম্যাণ্ডি বলেছে, একবার তাকে এক পার্টিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ; নিমন্ত্রণকর্তার পরনে সেখানে মোজা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তা ছাড়া একটি ডিনার পার্টিরও সে উল্লেখ করেছে, উলঙ্গ একটি মানুষ যেখানে মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ম্যাণ্ডি বলেছে, সমাজে তিনি একজন মান্য মানুষ, সুতরাং "মুখোশ না পরে তাঁর উপায় ছিল না।"

সাক্ষ্য দিয়েছে আরও অনেকে। তার মধ্যে ভিকি ব্যারেটের সাক্ষ্যই সব চাইতে মারাত্মক। সে যা বলেছে, তার থেকে মাত্র একটি সিদ্ধান্তেই পৌঁছনো সম্ভব। এবং সেই সিদ্ধান্ত ডঃ ওয়ার্ডের অনুকূলে যায়নি।

জুরির সিদ্ধান্ত ঃ ডঃ ওয়ার্ডের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। গণিকার উপার্জিত অর্থে তিনি জীবনধারণ করতেন।

আদালতের রায় অবশ্য শুনে যাননি ডঃ ওয়ার্ড। রায় যে তাঁর

বিপক্ষে যাবে, তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।, আদালত থেকে বাড়িতে ফিরে, সেই দিন রাত্রেই তিনি ঘুমের বড়ি খান। তাঁর ঘুম আর ভাঙেনি।

একজন অনেক বড় মাপের মানুষ। অন্যজন অনেক ছোট মাপের। তাই, তুলনা করবার কোন অর্থ হয় না। তবু বলি, যতই সামান্য হোক, অসকার ওয়াইল্ডের সঙ্গে ডঃ স্টীফেন ওয়ার্ডের সত্যিই কিছু মিল আছে। মিল শুধু এই নয় যে, ওয়াইল্ডের বিচারও একদিন এই ওল্ড বেইলিতেই হয়েছিল। তার চাইতে বড় মিল, ঠিক ওয়াইল্ডেরই মতন, আগ বাড়িয়ে নিজের সর্বনাশকে ডেকে এনেছেন ডঃ ওয়ার্ড। কে জানে, প্রোফুমো যে মিথ্যে বলেছেন, আগ বাড়িয়ে সেটা ধরিয়ে না দিলে ওয়ার্ডের উপরে কারও নজর পড়ত কি না। না-পড়লে তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকত না।

কিন্তু, ওয়াইল্ডের কথা বোধ হয় ওয়ার্ড কখনও ভাবেননি। তিনি ভেবেছেন অধ্যাপক হিগিনস-এর কথা। অর্থাৎ শ'য়ের সৃষ্ট সেই অদ্ভুত চরিত্রটির কথা, নিচুতলার একটি মেয়ের কক্‌নি বুলি ভুলিয়ে দিয়ে যিনি তার মুখে মার্জিত ভাষা বসিয়ে দিয়েছিলেন ; সেই মেয়েটিকে যিনি উঁচুতলার মানুষের সমাজে চালিয়ে দিয়েছিলেন। সত্যিই কি নিজেকে একজন 'অধ্যাপক হিগিনস' বলে ভাবতেন নাকি ডঃ ওয়ার্ড।

তার চাইতেও জরুরী প্রশ্ন, যে ভয়ঙ্কর নাটকের যবনিকা তিনি নিজের হাতে তুলেছিলেন, ওয়ার্ডের আত্মহত্যার সঙ্গে সঙ্গেই কি তার উপরে আবার যবনিকা পড়ল ?

প্রশ্নটা অকারণ নয়। এমন কথা কেউ বলছে না যে, এই 'আমুদে' ডাক্তারটি এক নিষ্কলঙ্ক দেবশিশু ছিলেন। না, তা তিনি ছিলেন না। আজ অবশ্য তাঁর জন্যে হঠাৎ সহানুভূতির বান ডেকেছে। কিন্তু নিজের মুখেই যে-সব কথা স্বীকার করেছেন ডঃ ওয়ার্ড, তাতে বুঝতে পারা যায়, গণিকার উপার্জিত অর্থে তিনি ভাগ বসিয়ে থাকুন আর না-ই

থাকুন, অন্য অনেক অন্ধকার ছিল তাঁর জীবনে; অন্য অনেক ব্যাধি ছিল। কিন্তু ব্যাধি যে তাঁর একার ছিল, তা ত নয়। ছিল আরও অনেকের। এমন অনেকের, সমাজে যাঁরা তাঁর চাইতে আরও অনেক বেশী মান্য। তাঁদের কী হবে? তাঁদের অপরাধের বৃত্তান্ত কি নেপথ্যেই থেকে যাবে? কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়েছিল একদিন। "সুতরাং প্রশ্ন উঠবে, বিষধর সেই সাপগুলির কথা কি সবাই ভুলে গেল?

জুলি গালিভার ভুলে যায়নি। ডঃ ওয়ার্ডের এই সর্বশেষ বান্ধবী বলেছে, তাদের "হাসিটা যাতে মুছে যায়, তার ব্যবস্থা আমি করব।"

ব্যবস্থা হয়ত ডঃ ওয়ার্ডও করেছেন। মৃত্যুর আগে তেরখানি চিঠি লিখেছেন তিনি। তের-সংখ্যাটা অশুভ। কাদের পক্ষে অশুভ, সেইটেই এখন জানা দরকার।

দুই মৃত্যু

একটি এশিয়ায়; অন্যটি আমেরিকায়। একটি আত্মহত্যা; অন্যটি হত্যা। কিন্তু অনায়াসেই এই পার্থক্যের কথা আমরা ভুলে থাকতে পারি। তার কারণ, জুন মাসের সেই মৃত্যু দুটির মধ্যে মিলও নেহাত কম নেই। মিল শুধুই মৃত্যুর নয়, জীবনেরও। দক্ষিণ ভিয়েতনামের বৌদ্ধ সন্নাসী থিক কোয়াং ডাক আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো নেতা মেডগার এভার্স, দুজনের জীবনই ছিল সংগ্রামী জীবন; আপন সম্প্রদায়ের জন্য তাঁরা দুজনেই কয়েকটি মৌল অধিকার আদায় করতে চেয়েছিলেন। বিনিময়ে মৃত্যুর মূল্য গুনে দিতেও তাঁদের আপত্তি ছিল না।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের কথাই আগে স্মরণ করা যাক।

সায়গনের রাস্তা দিয়ে একটি মিছিল ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল। হাজার মানুষের শান্ত একটি মিছিল। মিছিলে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মস্তক মুণ্ডিত, বস্ত্রের রঙ হলুদ। তাঁরা বৌদ্ধ ভিক্ষু। মিলিত অনুচ্চ গলায় তাঁরা বুদ্ধের নাম উচ্চারণ করছিলেন।

মিছিলের প্রায় পুরোভাগে ছিল সবুজ রঙের ছোট্ট একটি অস্টিন গাড়ি। সামনে এগোতে এগোতে মিছিলের মানুষগুলি হঠাৎ থেমে গেলেন; আর তখুনি খুলে গেল সেই অস্টিনের দরজা। বেরিয়ে এলেন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী থিক কোয়াং ডাক। দু পা হেঁটে গিয়ে তিনি ফুটপাথের উপরে জোড়াসন হয়ে বসলেন। ভিক্ষুরা ইতিমধ্যে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁকে। কিন্তু বুদ্ধের নামোচ্চারণে তাঁরা তখনও বিরত হননি। স্থির অকম্প শান্ত গলায় তাঁরা বলে যাচ্ছিলেন, 'নম্মো অমিতো বুদ্ধো···'

নম্মো অমিতো বুদ্ধো····নম্মো অমিতো বুদ্ধো····

রাস্তায় ইতিমধ্যে ভিড় জমে গিয়েছিল। কিন্তু কী যে ঘটতে চলেছে, তখনও তা কেউ বুঝতে পারেনি।

নম্মো অমিতো বুদ্ধো····নম্মো অমিতো বুদ্ধো····

পুলিস এসে দাঁড়িয়েছিল সেখানে। কিন্তু বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বেষ্টনী ভেদ করে সে ভিতরে ঢুকতে পারেনি।

নম্মো অমিতো বুদ্ধো....নম্মো অমিতো বুদ্ধো....

শান্ত পায়ে এগিয়ে গেলেন দুজন বৌদ্ধ ভিক্ষু। থিক কোয়াং ডাকের উপরে তাঁরা পাঁচ গ্যালন পেট্রল ঢেলে দিলেন।

নম্মো অমিতো বুদ্ধো···নম্মো অমিতো বুদ্ধো····

দেশলাইয়ের বাক্স ছিল কোয়াং ডাকের হাতেই। বাক্সের ভিতর থেকে তিনি একটি কাঠি বার করলেন ; বাক্সের গায়ে সেটাকে ঘষে দিলেন।

দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।

মিসিসিপির মানুষটি কিন্তু আত্মহত্যা করেননি।

নিগ্রো-আন্দোলনের তিনি একজন বিশিষ্ট কর্মী। তিনি চেয়েছিলেন, সাদা আর কালোর পার্থক্য ঘুচে যাক। চামড়ার রং কালো, নিতান্ত এইজন্যে যেন কালা আদমীদের আর কেউ দূরে ঠেলে রাখতে না পারে। কালা আদমীদের জন্যে তিনি সমান অধিকার আদায় করতে চেয়েছিলেন। বর্ণাভিমান যাদের প্রচণ্ড, সেই সাদারা তাঁকে ঘৃণা করত ; এবং সেই ঘৃণার কথাটা তাঁর অজানা ছিল না।

তিনি জানতেন, মৃত্যু তাঁর পিছু নিয়েছে। তিনি জানতেন, তাঁকে যারা ঘৃণা করে, তাঁর ছেলেদের হত্যা করতেও তাদের হাত কিছুমাত্র কাঁপবে না। ছেলেদের তিনি বলে দিয়েছিলেন, "বিপদ বুঝলেই মাটির উপরে সটান শুয়ে পড়বে।" এক বন্ধুকে তিনি বলেছিলেন, "গাড়ি থেকে যখনই বার হই, তখনই মনে হয়, এইবারে আমি মারা পড়ব।"

মিটিং সেরে গাড়িতেই তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। নীল রঙের ওল্ডসমোবিল গাড়ি। সঙ্গে ছিলেন গ্লস্টার কারেণ্ট; নিগ্রো

আন্দোলনের তিনিও একজন বিশিষ্ট কর্মী। কারেণ্টকে তিনি বলেছিলেন, "আমি ক্লান্ত। আমি বাড়ি যেতে চাই।"

আমি ক্লান্ত....আমি বাড়ি যেতে চাই....

কারেণ্টকে নামিয়ে দিয়ে বাড়িতেই ফিরে এসেছিলেন মেডগার এভার্স। মিসেস এভার্স তাঁর গাড়ির শব্দ পেয়েছিলেন, ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে তিনি বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

আমি ক্লান্ত....আমি বাড়ি যেতে চাই....

মিসেস এভার্স দেখতে পেয়েছিলেন যে, ওল্ডসমোবিলের দরজা খুলে সেই ক্লান্ত মানুষটি বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর স্বামীকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। ছেলেরা দেখতে পেয়েছিল বাবাকে।

আমি ক্লান্ত.....আমি বাড়ি যেতে চাই....

মেডগার এভার্স তাঁর গাড়ির ভিতর থেকে একটা বাণ্ডিল বার করে আনছিলেন। শার্টের বাণ্ডিল। গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য যারা সংগ্রাম করছে, সেই নিগ্রো কর্মীদের মধ্যে কাল সকালেই এই শার্ট বিলিয়ে দিতে হবে।

আমি ক্লান্ত....আমি বাড়ি যেতে চাই....

কিন্তু বাড়ির মধ্যে আর যাওয়া হল না। রাত্রির অন্ধকারকে চমকে দিয়ে হঠাৎ রাইফেল গর্জে উঠল।

আমি ক্লান্ত....আমি ক্লান্ত....আমি....

টলতে টলতে কয়েক পা এগিয়ে এলেন মেডগার এভার্স। তারপরে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়লেন।

সায়গনে ফিরে যাওয়া যাক।

প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে, গায়ে পেট্রোল ঢেলে, এবং নিজের হাতে সেই পেট্রোলে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে, সর্বসমক্ষে কেন অমনভাবে সেদিন আত্মহত্যা করলেন থিক কোয়াং ডাক?

অকারণে করেননি। দক্ষিণ ভিয়েতনামের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের এক মৌল অধিকার যারা হরণ করেছে, তাদের অন্ধ বিদ্বেষের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানতে চেয়েছিলেন, এবং সেই প্রতিবাদের প্রতি তিনি সর্ব-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন।

প্রতিবাদের প্রয়োজন ছিল।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের মোট জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা আশিজনই বৌদ্ধ। বাকি কুড়িজনের মধ্যে দশজন ক্যাথলিক; দশজন অন্য কিছু। অথচ সেখানকার রাষ্ট্রশক্তি এখন ক্যাথলিকদের হাতে, এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দাবিয়ে রাখতে তাঁরা চেষ্টার ত্রুটি করেননি। সেই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে একটা চাপা অসন্তোষের আগুন সেখানে অনেক দিন থেকেই জ্বলছিল।

সে-আগুনে প্রথম কবে ছড়িয়ে গেল সবখানে? সম্ভবত সেইদিন, হুয়ে শহরে বৌদ্ধদের যেদিন জানিয়ে দেওয়া হল যে, তাঁরা তাঁদের ধর্মীয় পতাকা উত্তোলন করতে পারবেন না।

গত মাসের কথা। প্রেসিডেণ্ট দিয়েমের ভাই আর্চবিশপ নো দিন থুক-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে হুয়ের ক্যাথলিক অধিবাসীরা এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে তাঁরা ভ্যাটিকানের পতাকা ওড়ান; কেউ তাতে আপত্তি জানায়নি। আপত্তি জানানো হল বৌদ্ধদের বেলায়। গৌতম বুদ্ধের জন্মদিবসে যখন তাঁরা তাঁদের পীতবর্ণের পতাকা ওড়াতে চাইলেন, সরকার থেকে তখন নিষেধাজ্ঞা জারী করা হল। বৌদ্ধরা এই পক্ষপাতী নীতির প্রতিবাদ জানালেন, বিক্ষোভের মিছিল বার করলেন। তারপরেই বেরিয়ে এল সাঁজোয়া গাড়ি। গুলি চলল।

হুয়েতে সেদিন সাতজনের মৃত্যু ঘটেছিল। বৌদ্ধরা বললেন, প্রেসিডেণ্ট দিয়েমের সৈন্যরাই এই মৃত্যুর জন্য দায়ী। সরকার দায়ী করলেন কমিউনিস্টদের।

যে-ই দায়ী হক, বৌদ্ধদের আন্দোলন সেখানেই থেমে থাকেনি।

আন্দোলন ক্রমেই ব্যাপক হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আন্দোলনকারীদের দাবি, তাঁদের ধর্মাচরণের উপর যেসব বিধিনিষেধ জারী করা হয়েছে, সেগুলি প্রত্যাহার করতে হবে; চাকরির ব্যাপারে বৌদ্ধদের এখন থেকে সমান সুযোগ দিতে হবে; এবং হুয়েতে যাঁরা হতাহত হয়েছেন, তাঁদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

ধর্মাচরণের ব্যাপারে বিধিনিষেধের বেড়ি ত আছেই, চাকরি বণ্টনের নীতিটাও খুব সন্দেহাতীত নয়। দক্ষিণ ভিয়েতনামের অসামরিক সরকারি চাকরিগুলি সাধারণত ক্যাথলিকরাই পেয়ে থাকেন, এবং সামরিক চাকরিতেও নাকি সচরাচর তাঁদেরই পদোন্নতি হয়, যাঁরা বৌদ্ধ নন। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতারা অভিযোগ তুলেছেন যে, পদোন্নতির আশায় অনেক তরুণ ভিয়েতনামী আর্মি অফিসার এখন ধর্মান্তর গ্রহণ করছেন। বুদ্ধকে ছেড়ে যিশুর দিকে ঝুঁকছেন। সদ্য-ধর্মান্তরিত এমন একজন তরুণ অফিসার সম্পর্কে এক মার্কিন অফিসার নাকি সম্প্রতি বলেছেন, "বিপদে পড়লে অবশ্য ও বুদ্ধের কাছেই প্রার্থনা জানাবে।"

বুদ্ধের কাছেই যে প্রার্থনা জানাবে, তাকে ক্যাথলিক হতে হয় কেন? হতে হয়, তার কারণ, সে জানে যে, ক্যাথলিক না হলে চাকরিতে তার উন্নতি হবে না। দক্ষিণ ভিয়েতনামের বৌদ্ধদের আশঙ্কা, দিয়েম সরকার এখন ক্যাথলিসিজমকেই রাষ্ট্রধর্ম করে তুলতে ইচ্ছুক। দিয়েমের ভ্রাতৃবধূ মাদাম নো দিন নুর উগ্র ক্যাথলিকতা সেই আশঙ্কাকে আরও তীব্র করে তুলেছে। বৌদ্ধরা অতএব আন্দোলনের শরণ না নিয়ে পারেননি।

সায়গনের ঘটনা তার পরিণতি।

আন্দোলন চলছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও। সে-আন্দোলন ধর্ম-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে নয়, বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে। তা ছাড়া দক্ষিণ ভিয়েত-নামের দিয়েম-সরকারের বিরুদ্ধে বৌদ্ধরা যে পক্ষপাতের অভিযোগ

তুলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকারের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই নিগ্রো-সমাজের তেমন কোনও অভিযোগ নেই। নিগ্রোদের অভিযোগ সেই সমস্ত অঙ্গরাজ্য বা স্টেটের প্রশাসনের বিরুদ্ধে, ধলারা যেখানে কালাদের আজও দূরে ঠেলে রেখেছে। যেখানে ধলার ইস্কুলে কালারা যেতে পারে না, যেখানে ধলার হোটেলে কিংবা ক্লাবে ঢুকলে কালাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। কালাদের আন্দোলন চলছিল সেই বিদ্বেষের বিরুদ্ধে। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকার অবশ্য সেই আন্দোলনে উৎসাহ দেননি। দেওয়া সম্ভবও ছিল না। কিন্তু নিগ্রোদের দাবির প্রতি তাঁদের পূর্ণ সমর্থন ছিল। দাবি আদায়ের জন্যে তাঁরা নিগ্রো সমাজের পাশেই এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

আন্দোলনের কেন্দ্র তখন আলাবামা। নিগ্রো দুটি ছেলেমেয়েকে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হবে। ছেলেটির নাম জেমস হুড। মেয়েটির নাম ভিভিয়ান ম্যালোন। দুজনের বয়সই কুড়ি। তাদের আগে আর কোনও নিগ্রো যে কখনও আলাবামার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি, এমন কথা অবশ্য বলা যায় না। সাত বছর আগে অথরিন লুসিকে সেখাতে ভর্তি করা হয়েছিল। সেও নিগ্রো মেয়ে। কিন্তু ভর্তি হলেও সেখানে সে পড়াশুনো করেনি। করা সম্ভব ছিল না। বর্ণাভিমানী শ্বেতাঙ্গ ছাত্ররা সেখানে তার বিরুদ্ধে এক তুমুল হল্লার আয়োজন করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের বাড়ির সামনে গিয়ে তারা উন্মত্তের মত স্লোগান দিয়েছিল ঃ

“আলাবামাকে সাদা রাখো !”

“অথরিন নিপাত যাক !”

অথরিনকে বিদায় নিতে হয়েছিল, এবং তারপর সাত বছরের মধ্যে আর কোনও নিগ্রো ওদিকে পা বাড়ায়নি।

পা বাড়াল ১৯৫৩ সনে। অনেকেই ভেবেছিলেন, শ্বেতাঙ্গ ছাত্র-মহল হয়ত এবারেও সেই একই হল্লার পুনরাবৃত্তি করবে। কথাটা

তাঁরা অকারণে ভাবেননি। শ্বেতাঙ্গ জনসাধারণের মধ্যে যারা কৃষ্ণ-দ্বেষী, প্রাণপণে তারা চেষ্টা করছিল, জেমস আর ভিভিয়ান যাতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ঢুকতে না পারে। আবহাওয়াকে তারা বিষিয়ে তুলছিল। প্রকাশ্যেই তারা বলে বেড়াচ্ছিল যে, নিগ্রোদের তারা বরদাস্ত করবে না। স্বয়ং গবর্নর ওয়ালেস ছিলেন তাদের পাণ্ডা। একদা-বক্সার এই মানুষটি একদিন বুক ফুলিয়ে বলেছিলেন, ফেডারেল সরকারের আদেশ তিনি মানবেন না; যদি দরকার হয় ে নিজে গিয়ে তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দরজায় দাঁড়াবেন, নিগ্রোদের তিনি ঢুকতে দেবেন না। ফেডারেল সরকার যদি তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চায় ত করুক।

নেহাতই ফাঁকা আওয়াজ। ওয়ালেস ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে, ফেডারেল সরকার এক্ষেত্রে নতিস্বীকারে রাজি নন। নিগ্রোদের পাশ থেকে তাঁরা সরে দাঁড়াবেন না। তাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের দোর-গোড়ায় গিয়ে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন বটে, কিন্তু জেমস আর ভিভিয়ানকে তিনি বাধা দেননি।

তার চাইতেও বড় কথা, ক্লাসে ঢুকবার পরে শ্বেতাঙ্গ ছাত্ররা এই কৃষ্ণকায় ছেলেমেয়ে দুটিকে সেদিন সোৎসাহ অভ্যর্থনা জানিয়ে-ছিল।

যাক, বিপদ তাহলে কেটে গেল। যাঁরা ভদ্র, যাঁরা শান্ত, তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

দুঃসংবাদ এল তার পরদিন সকালে। এবং দুঃসংবাদ এল মিসিসিপি থেকে। জ্যাকসন শহরের নিগ্রো নেতা মেডগার এভার্স নিহত হয়েছেন।

সায়গনের জা লোয়া প্যাগোডায় ধূপের সুরভি বিকীর্ণ হচ্ছিল। ধীর শান্ত গলায় মন্ত্রোচ্চারণ করছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা। আর পুণ্যার্থী জনতা তাকিয়ে ছিল কাচের পাত্রে রাখা একটি অর্ধদগ্ধ মাংস-খণ্ডের দিকে। থিক কোয়াং ডাকের হৃৎপিণ্ডের দিকে।

আশ্চর্য !

গায়ে পেট্রোল ঢেলে, নিজের হাতে সেই পেট্রোলে আগুন জ্বালিয়ে আত্মহত্যা করেছেন থিক কোয়াং ডাক। কিন্তু আগুনে পুড়ে যিনি মারা গেলেন, তাঁর হৃৎকমল সেদিন পুড়ে ছাই হয়ে যায়নি।

লেলিহান অগ্নিশিখাও যাঁর হৃৎপিণ্ডকে সেদিন দগ্ধ করতে পারেনি, দিয়েম সরকার কি তাঁর নীরব প্রতিবাদকে স্তব্ধ করে দিতে পারবেন ? পারবেন বলে মনে হয় না। কেননা, কোয়াং ডাকের মৃত্যুর পরে, হয়ত বা তাঁর মৃত্যুর ফলেই, এখন দক্ষিণ ভিয়েতনামের বৌদ্ধ-সমাজের বিক্ষোভ আরও দানা বেঁধে উঠছে। এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও হয়ত এ-ব্যাপারে আর নিতান্ত নীরব দর্শক হয়ে থাকবে না। দিয়েম সরকারের বিরুদ্ধে যে এখন জনমত খুবই প্রবল, যুক্তরাষ্ট্র তা জানে। তা ছাড়া দক্ষিণ ভিয়েতনামে যে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বদল ঘটছে, সেটা নিশ্চয়ই অকারণ নয়। রাষ্ট্রদূত বদলের সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন নীতিও যদি বদলায়, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

"মরতে আমি ভয় পাই না।" মেডগার এভার্স বলেছিলেন, "কে জানে, আমার মৃত্যুর পরিণাম হয়ত ভালই হবে।"

ক্লান্ত যে-মানুষটি সেদিন বাড়ি ফিরতে চেয়েছিলেন, আততায়ীর রাইফেল যে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে, তা কি তিনি জানতেন ? নিশ্চয়ই জানতেন না, কিন্তু মৃত্যুকে তিনি ভয় পাননি। এবং সেই মহান মৃত্যুর ফলে যে এখন নিগ্রোদের দাবি আরও অসংখ্য মানুষের সমর্থন পাবে, তাতেই বা সন্দেহ কী।

একজনের মৃত্যু ঘটেছে দক্ষিণ ভিয়েতনামে। অন্যজনের আমেরিকায়। কিন্তু দুই মৃত্যুর সাদৃশ্য তবু দুর্লক্ষ্য নয়।

অন্য হ্যারল্ড

“আমরা আমাদের প্রশ্নের উত্তর চাই। মিঃ ম্যাকমিলান কেন মিঃ প্রোফুমোর পদত্যাগে সম্মতি দেননি? মিঃ প্রোফুমো কি সত্যিই পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন? যদি না-চেয়ে থাকেন, তাহলে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে পদত্যাগ করতে বলেননি কেন?”

কমন্স-সভায় সেদিন এই প্রশ্ন যিনি তুলেছিলেন, উত্তরের জন্য তিনি অপেক্ষা করেননি। বলেছিলেন, কেন তাঁকে পদত্যাগ করতে বলা হয়নি, “তা আমরা জানি। আজ আর আমাদের এই সিদ্ধান্তে না-পৌঁছে উপায় নেই যে, দেশের নিরাপত্তার চাইতে রাজনৈতিক স্বার্থই বড় হয়ে উঠেছিল। জন্ম-জুয়াড়ীদের স্বভাবই এই রকম।”

সেইখানেই তিনি থামেননি। আঙুল তুলে, ধিক্কার জানাবার ভঙ্গিতে, তিনি বলেছিলেন, “কাগজে যতই বিবৃতি দেওয়া হক, মন্ত্রিসভার বৈঠক যত ঘনঘনই বসুক, এবং পার্টি-কমিটী যা-ই করুক না কেন, এই উলঙ্গ সত্যকে আর আজ কিছুতেই চেপে রাখা যাবে না যে, ক্রমাগত যে-সব বিপদের ঝুঁকি নেওয়া হয়েছে, ওই মানুষটিই তার জন্য দায়ী।”

বক্তৃতা দিচ্ছিলেন মিঃ উইলসন, এবং তিরস্কারের তর্জনীকে তিনি মিঃ ম্যাকমিলানের দিকে তুলে ধরেছিলেন। হ্যারল্ড ম্যাকমিলানের মুখে সেদিন হাসি ছিল না। স্থির গম্ভীর মুখ। নিঃশব্দে সেই মানুষটিকে তিনি দেখছিলেন, যাঁর সঙ্গে অন্তত একটা ব্যাপারে তাঁর মিল আছে। লেবার পার্টির নতুন নেতা মিঃ উইলসনেরও আদ্য-নাম হ্যারল্ড।

হ্যারল্ড উইলসনের বয়স এখন সাতচল্লিশ। আসন্ন নির্বাচনে যদি লেবার পার্টি জেতে, তাহলে উইলসনই হবেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী।

এখানে উল্লেখ করা ভাল যে, বিশ শতকের ব্রিটেনে এত অল্প বয়সে আর কেউ প্রধানমন্ত্রী হননি। প্রশ্ন হচ্ছে, উইলিয়ম পিটের পরে কি আর-কেউ উইলসনের মত এত অল্প বয়সে মন্ত্রী হতেই পেরেছিলেন? তাও বোধ হয় কেউ পারেননি। অ্যাটলির মন্ত্রিসভায় উইলসন ছিলেন প্রেসিডেন্ট অব দি বোর্ড অব ট্রেড: তাঁর বয়স তখন একত্রিশ।

বয়স অল্প হলেও তাঁর অভিজ্ঞতা অতএব নেহাত অল্প নয়। তা ছাড়া তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি মানুষ। লেবার এম-পি রিচার্ড ক্রসম্যানের মতে "বুদ্ধির বিচারে যদি লয়েড জর্জের পরে আর মাত্র একজন রাজনীতিকের নাম করতে হয় ত আমি হ্যারল্ড উইলসনের নাম করব।" নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক বলেন, "দি শার্পেস্ট, ফাস্টেস্ট ব্রেন ইন পার্লামেন্ট।" এ-সবই প্রশংসার কথা। এদিকে হ্যারল্ড উইলসনের প্রশংসায় যাঁরা পরাঙ্মুখ, তাঁদের সংখ্যাও নেহাত কম হবে না। সত্যি বলতে কী, বিস্তর বিরোধী আছে তাঁর আপন দলের মধ্যেই। তাঁদেরই একজন সম্প্রতি নাকি দুঃখ করে বলেছেন যে, গেটস্কেল যাঁকে দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না, সেই হ্যারল্ড উইলসনের হাতেই কিনা লেবার পার্টির ভার পড়ল!

ভাবতে সত্যিই দুঃখ হয় যে, দীর্ঘদিন বাদে আবার যখন লেবার পার্টির হাতে ক্ষমতা আসবার একটা প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, হিউ গেটস্কেল তখন বেঁচে নেই। অথচ, এই একটি মানুষের দৃষ্টি সব সময়ে সজাগ ছিল বলেই হয়ত লেবার পার্টির ঐক্যে আজও ফাটল ধরেনি। কিংবা বলতে পারি, ফাটল ঠিকই ধরেছিল, কিন্তু গেটস্কেল তাঁর পার্টিকে তবু ধসে পড়তে দেননি। বিপদকে তিনি গ্রাহ্য করেননি; বিপর্যয়ে তিনি স্থির থেকেছেন; এবং—শুধুই বাইরে থেকে নয়—ভিতর থেকেও যখন বার বার আঘাত এসেছে, তখনও তিনি অটল মমতায় বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁর পার্টিকে; পরম যত্নে অসীম ধৈর্যে তাকে দৃঢ়, সংহত করে তুলেছেন।

রক্ষণশীল দলের আজ বড়ই দুর্দিন। ম্যাকমিলান-সরকারের দুর্গ আর আজ দুর্ভেদ্য নয়। সারা ব্রিটেন জুড়ে আজ সমালোচনার ঝড় উঠেছে, এবং—এমন কী—টাইমস পত্রিকার রসনাও আজ নিন্দায় মুখর। একটার-পর-একটা উপনির্বাচনে রক্ষণশীল দলের হার হয়েছে। হওয়া স্বাভাবিক। কেননা ব্রিটেনের সামনে আজ যে-সব সমস্যা দেখা দিয়েছে, রক্ষণশীল দল তার সমাধান করতে পারবেন কি না জনসাধারণ সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত নন। সমস্যা শুধুই ঘরোয়া নয়; সমস্যা আছে বাইরেও। ঘরে আছে বেকার-সমস্যা; বাইরে কমন-মার্কেট। তা ছাড়া আছে খুচরো আরও অসংখ্য রকমের সমস্যা, যার সমাধানে এখনও রক্ষণশীল সরকার বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। তার উপরে, বলাই বাহুল্য, ভ্যাসাল-কেলেঙ্কারির পরে তাঁদের সুনাম অনেকটা কলঙ্কিত হয়েছে। সুনামের যেটুকু বাকী ছিল, প্রোফুমো তাকেও শেষ করে ছাড়লেন। সোভিয়েট ন্যাভাল অ্যাটাশে ক্যাপ্টেন আইভানভ যাঁর কাছে নিয়মিতভাবে যেতেন, ব্রিটেনের সমরমন্ত্রীও যে সেই পণ্যা-নারীর প্রণয়ের অংশীদার ছিলেন, এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা নিশ্চয়ই আসন্ন নির্বাচনে রক্ষণশীল দলকে বিশেষ সাহায্য করবে না। তার চাইতেও মারাত্মক কথা, পার্লামেণ্টে প্রোফুমো সেই প্রণয়-লীলার কথা স্বীকার করেননি। 'ডার্লিং' মিস কীলারের সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্কের কথা তিনি অস্বীকার করেছিলেন। পার্লামেণ্টকে তিনি মিথ্যা কথা বলেছিলেন।

প্রোফুমোকে বিদায় নিতে হয়েছে। কিন্তু রক্ষণশীল দলের তবু রাহুমুক্তি হয়নি। হবার কথাও নয়। ছায়া নেমেছে পার্টির উপরে, ছায়া নেমেছে সরকারের উপরে। নিরাপত্তার ব্যাপারে যাঁরা এত অসতর্ক, প্রশ্ন উঠেছে, তাঁদের উপরে আস্থা রাখা যায় কিনা। প্রশ্ন শুধুই নিরাপত্তার নয়, নীতিরও। রক্ষণশীল দলকে এখন এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। দেওয়া সহজ হবে না।

নির্বাচন কবে হবে? ম্যাকমিলান সরকারের সুনামের শেয়ার

এখন পড়তির মুখে। রক্ষণশীল দলের আভ্যন্তর বিবাদ এখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। গত নির্বাচনে তাঁদের স্লোগান ছিল 'ইউ নেভার হ্যাড ইট সো গুড'। সেই স্লোগান নিয়ে আজ ব্যঙ্গ করে সবাই। অনেকে বলেন, "ওই ইউ-নেভার-হ্যাড-ইট-সো-গুড-মেণ্টালিটিই হচ্ছে নষ্টের গোড়া। ওই আত্মপ্রসাদের থেকেই এসেছে অসতর্কতা; আর তারই ফলে এখন রক্ষণশীল দলকে ডুবতে হচ্ছে।"

বলা বাহুল্য, যদি কিছুটা সময় পাওয়া যায়, ডুবন্ত পার্টি তাহলে আবার ভেসে উঠতে পারে। রাজনৈতিক পার্টির জীবনে এমন ডোবা-ভাসা কিছু নতুন ব্যাপার নয়। কিন্তু ভেসে উঠবার আগেই যদি নির্বাচনের আয়োজন করতে হয়, লেবার পার্টিকে তাহলে সম্ভবত ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। এবং, গেটস্কেল নন, উইলসনই তাহলে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হবেন।

দশ-নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে যাঁর যাবার কথা ছিল, তিনি গেটস্কেল। কিন্তু গেটস্কেল আজ পরলোকে, এবং উইলসন এখন লেবার পার্টির নেতা। অবশ্য উইলসনই যে নেতা হবেন, এমন কথা এই সেদিন পর্যন্তও অনেকে ভাবতে পারেনি। না পারাই স্বাভাবিক। কেননা, লেবার পার্টির আকাশে তখন আর-একটি নাম খুব উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছিল। জর্জ ব্রাউনের নাম। ট্রাক-ড্রাইভারের ছেলে তিনি; নিজেও একটু রুক্ষ প্রকৃতির মানুষ। স্পষ্ট কথা বলতে তাঁর জিহ্বা বিশেষ কুণ্ঠিত হয় না। ১৯৫৬ সনে ক্রুশ্চফ যখন ব্রিটেন সফরে আসেন, তখন তাঁকেও নাকি তিনি স্পষ্ট কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। হাঙ্গেরি সম্পর্কে ক্রুশ্চফকে তিনি বলেছিলেন, "মে গড ফরগিভ য়ু।"

পার্টির মধ্যে জর্জ ব্রাউনের প্রভাব নেহাত অল্প ছিল না। কিন্তু তবু যে তিনি নেতা নির্বাচিত হলেন না, স্বভাবের এই রুক্ষতাই নাকি তার অন্যতম কারণ। নেতা হলেন হ্যারল্ড উইলসন; নাই বিভানের শিষ্য। আসন্ন নির্বাচনে যদি লেবার পার্টি জেতে, নাই বিভানের এই শিষ্যটিই তাহলে দশ-নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে গিয়ে ঢুকবেন।

বাল্যকাল থেকেই কি হ্যারল্ড সে-কথা জানতেন ?

বলা সম্ভব নয়। বাল্যকালে ত কতজনেই কত স্বপ্ন দেখে। কেউ-বা লেখক হবার স্বপ্ন দেখে, কেউ-বা পাইলট হবার। হ্যারল্ড উইলসন কি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন? ইয়র্কশায়ারের এক কেমিস্টের ঘরে যাঁর জন্ম, সেই ছেলেটি কি কখনও ভাবতে পেরেছিলেন, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবন দশ-নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটের দরজা একদিন তাঁর সামনে খুলে যাবে ? এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব। তবে একটা কথা বলা যেতে পারে। সেটা এই যে, হ্যারল্ডের বয়স যখন মাত্র আট, তখন ডাউনিং স্ট্রীটের সেই বিখ্যাত বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি একটা ছবি তুলিয়েছিলেন। আর-একটা কথারও উল্লেখ করা দরকার। "পঁচিশে আমি কী হব" এই বিষয়ে তিনি বারো বছর বয়সে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, পঁচিশে তিনি মন্ত্রী হবেন, এবং গ্রামোফোন-রেকর্ডের উপরে ট্যাক্স বসাবেন। বলা বাহুল্য, হ্যারল্ড-পরিবারে তখন গ্রামোফোন ছিল না।

পঁচিশে নয়, একত্রিশ বছর বয়সে তিনি মন্ত্রী হয়েছিলেন। তার আগে, দর্শন রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে, তিনি অক্সফোর্ডের পাঠ সাঙ্গ করেছেন। কয়লা-শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা সম্পর্কে একখানি বইও লিখেছিলেন তিনি। সেই বইয়ের সূত্রেই তিনি অ্যাটলির সান্নিধ্যে আসেন।

অ্যাটলি তাঁকে স্নেহ করতেন, নাই বিভান তাঁর সহায় ছিলেন, শ্রমিক-সরকারে একটা ছোটখাটো মন্ত্রীর পদও জুটে গিয়েছিল হ্যারল্ড উইলসনের। কিন্তু দলের মধ্যে প্রভাব বিস্তার তবু সহজ হয়নি। অনুরাগী অনেক ছিল, কিন্তু শত্রুর সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। বিভানের এই তরুণ শিষ্যকে তাঁরা ঠাট্টা করে বলতেন "নাই'জ লিট্‌ল ডগ।" এখানে উল্লেখযোগ্য, ১৯৫১ সনে নাই বিভান যখন অ্যাটলি-সরকার থেকে বেরিয়ে আসেন, তখন হ্যারল্ডও তাঁর মন্ত্রিত্বের পদে

ইস্তফা দিয়েছিলেন.। বিরোধের বিষয় ছিল নীতিগত। পুনরস্ত্র-সজ্জা এবং জাতীয় স্বাস্থ্যরক্ষা-বিধির কানুন নিয়ে মতান্তর ঘটেছিল। বামপন্থী বিভান আর তাঁর শিষ্য উইলসন সে-দিন মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নিতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করেননি।

বছর কয়েক বাদেই কিন্তু উইলসন আবার শ্যাডো ক্যাবিনেটে ফিরে এলেন। দলের দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে হাত মেলালেন। বললেন, "দলের ঐক্যই হচ্ছে সবচাইতে বড় কথা।" হয়ত তাই; কিন্তু অনেকের মনেই সেদিন এই প্রশ্ন জেগেছিল যে, ঐক্যই যদি সবচাইতে বড় কথা হবে, তাহলে মাত্র কয়েক বছর আগে তিনি সরকার থেকে বিদায় নিয়েছিলেন কেন? ঐক্যের কথা সেদিন তাঁর মনে ছিল না?

প্রশ্ন আছে সাংবাদিকদেরও। লেবার পার্টির নেতা নির্বাচিত হবার পরে উইলসনকে নিয়ে ফ্লীট স্ট্রীটে একটি ছড়া বাঁধা হয়েছে। সপ্রশ্ন ছড়া। তার ভাবানুবাদ অনেকটা এই রকম :

খ্রুশ্চফ চায় টকটকে লাল রং,
ম্যাক ত নীলের ভক্ত!
তুমি কোন্ রং চাইছ উইলসন?

প্রশ্নটা একেবারে অকারণ নয়। বস্তুত, একধিকবার বাঁ থেকে ডাইনে ঘুরেছেন বলেই হ্যারল্ড উইলসনকে নিয়ে আজ এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। নাই বিভানের এই শিষ্যটি যে কখন কোন্ পথে মোড় নেবেন, তা নিশ্চয় করে কেউ বলতে পারেন না। পার্টির মধ্যে যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, তাঁরাও না। বন্ধু না-বলে 'ঘনিষ্ঠ সহকর্মী' বললাম এইজন্যে যে, ঠিক 'বন্ধু' বলতে যা বোঝায়, হ্যারল্ডের তা নেই বললেই হয়। অন্তত রাজনৈতিক জীবনে নেই। কে জানে, খুব বেশী অন্তরঙ্গতায় তাঁর আপত্তি আছে কিনা। তবে, তাঁর হ্যাম্পস্টেড গার্ডেনের বাড়িতে যাঁরা নেমন্তন্ন পেয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা নাকি আঙুলে গুনে বলে দেওয়া যায়। বাড়িতে আছেন তাঁর স্ত্রী মেরি, আর দুটি ছেলে।

বিদেশের এক পত্রিকায় কিছুদিন আগে হ্যারল্ড উইলসন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ বার হয়েছে। তাতে হ্যারল্ডের এক সহকর্মীর যে মন্তব্য আছে, সেটা তুলে দিচ্ছি। তিনি বলছেন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হ্যারল্ডের যতই সমর্থক থাক, "তাঁর বন্ধু নেই। তিনি কাউকে কাছে টানেন না। তবে হ্যাঁ, তিনি বুদ্ধিমান মানুষ এবং দেশকে তিনি বুদ্ধির যোগান দিতে পারবেন।"

প্রশ্ন হচ্ছে, দেশকে তিনি কোন্ পথে নিয়ে যাবেন? বাঁয়ে গেলে কতটা বাঁয়ে যাবেন, ডাইনে গেলে কতটা ডাইনে? লেবার পার্টি যদি ক্ষমতায় আসে, তাহলে ইস্পাতশিল্প যে রাষ্ট্রায়ত্ত হবে, তাতে বোধকরি কারও সন্দেহ নেই। তা ছাড়া বেতন, পরিবহণ, শিক্ষা এবং অন্যান্য আর-পাঁচটা ব্যাপারেও কিছু-কিছু সংস্কার হবে। পার্টির নেতারা অন্তত এই রকমের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, যে-সব সমস্যার এখানে উল্লেখ করা হল, সেগুলি ব্রিটেনের নিজস্ব সমস্যা। ঘরোয়া সমস্যা। যেগুলি নেহাত ঘরোয়া সমস্যা নয়, অর্থাৎ আর-পাঁচটা দেশের স্বার্থও যার সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছে, তার মধ্যে কমন মার্কেট এবং পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার উল্লেখ করতে পারি। লেবার পার্টি এই দুইয়েরই বিরোধী।

লেবার পার্টির কর্মপন্থার কিছু আভাস এখানে দেওয়া হল। কিন্তু প্রশ্নটা তবু থেকেই যাচ্ছে। উইলসনের নেতৃত্বে ব্রিটেন এই কর্মপন্থাকে আঁকড়ে থাকবে কিনা? রাষ্ট্রতরণীকে শেষ পর্যন্ত কোন্ পথে চালাবেন তিনি? আপসের প্রয়োজন দেখা দিলেও কি তিনি তাঁর আপন নীতিতে অটল থাকবেন?

এ-সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় শক্ত। তার কারণ, নীতির প্রতি তাঁর প্রীতি খুবই গভীর বটে, কিন্তু তাই বলে তিনি চরমপন্থী মানুষ নন। নীতিগত কারণে নাই বিভানের সঙ্গে তিনি মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিয়েছিলেন। ঠিক কথা। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি আপস করতে জানেন না। আপস তিনি এই সেদিনও

করেছিলেন। ১৯৬০ সনের কথা। শান্তিবাদী আর বোমাবিরোধীদের সমর্থন নিয়ে, লেবার পার্টির নেতৃত্বের জন্য, তিনি গেটস্কেলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিলেন। কিন্তু সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যখন তিনি ভীষণভাবে হেরে গেলেন, তখন নিজের সমর্থকদের পরিত্যাগ করে গেটস্কেলের সঙ্গে হাত মেলাতেও তাঁর আপত্তি হয়নি।

অনেকে বলবেন 'সুবিধাবাদী'। কিন্তু কথাটা হয়ত সত্য নয়। আসলে 'বাস্তববাদী' হওয়াকেই অনেকে 'সুবিধাবাদী' হওয়া বলে মনে করেন। তাঁরা জানেন না যে, যিনি কাজ করতে চান, অনেক সময়েই তাঁকে আপস করতে হয়। না করে উপায় থাকে না।

উইলসনের যাঁরা বিরোধী, লেবার পার্টি'র এই তরুণ নেতার অন্তত আরও একটা সমালোচনা তাঁরা করে থাকেন। তিনি নাকি ভাল বক্তা নন। ঠাট্টা করে একটা কাগজে লেখা হয়েছিল, "স্বয়ং চার্চিলও যদি উইলসনের হয়ে একটা জ্বালাময়ী বক্তৃতা লিখে দেন, তবু তিনি সেই বক্তৃতাটা ঠিকমত পড়ে উঠতে পারবেন না। এমনভাবে পড়বেন যে, মনে হবে যেন ওটা বক্তৃতা নয়, কারও কবরের উপরে উৎকীর্ণ একটা স্মৃতিফলক মাত্র।"

কথাটা কি সত্যি? এককালে হয়ত সত্যি ছিল, কিন্তু এখনকার উইলসন সম্পর্কে এই নিন্দাটা আর খাটে কি না, তাতে সন্দেহ করি। সেদিনকার কথাই ধরা যাক।

"লণ্ডনের এক রহস্যময় অন্ধকার জগতের দরজা আজ আমাদের চোখের সামনে হঠাৎ খুলে গেল। এমন এক ন্যক্কারজনক জীবনের পরিচয় পেলাম আমরা, যা পাপে পরিপূর্ণ। নিষিদ্ধ নেশা, ব্ল্যাকমেল, পাল্টা-ব্ল্যাকমেল, হিংসা এবং যাবতীয় অন্যায়ের লীলা সেখানে অবাধে চলেছে।...

"এই রকমের কেলেঙ্কারির খবর কি আরও পাওয়া যাবে নাকি? সরকার যা যা জানেন, তার সবই কি তাঁরা আমাদের জানিয়েছেন?

নাকি মরিয়া হয়ে তাঁরা আরও অনেক খবর চেপে যাচ্ছেন, আর ভাবছেন যে, সে-সব খবর কখনো প্রকাশ পাবে না?"

কমন্স-সভায় দাঁড়িয়ে, ধিক্কারের ভঙ্গিতে আঙুল তুলে, এই কথাগুলি যিনি উচ্চারণ করেছেন, কী করে আর বিশ্বাস করব যে, তিনি একজন পাকা বক্তা নন?

নেপথ্য-নায়ক

জীবনে অনেক বিচিত্র ঘটনা ঘটে। এমন অনেক বিস্ময়কর ঘটনা, কল্পনাকেও যা হার মানিয়ে দেয়। এখানে ঠিক তেমনি একটি ঘটনার কথা শোনাব। কিন্তু, প্রিয় পাঠক, তার আগে একটা প্রশ্ন করি। আপনি কি হল্ ওয়ালিসকে চেনেন?

চেনেন না? তাহলে বলব, বিদেশী ফিল্ম-এর সঙ্গে আপনার পরিচয় বিশেষ ঘনিষ্ঠ নয়। ওয়ালিস একজন মস্তবড় প্রডিউসর। চিত্র-জগৎ তাঁকে নিয়ে গর্ব করে। করা স্বাভাবিক। তার কারণ, তাঁর অধিকাংশ ছবিতেই এমন কিছু-না-কিছু বস্তু থাকে, বাজার-চলতি আর-পাঁচটা ছবির মধ্যে যা খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর ছবিতে চটক না থাকে, চমক থাকে। জলুস না থাকে, জীবন থাকে। সর্বোপরি থাকে জীবন সম্পর্কে সেই গভীর সহানুভূতি, ছবির রাজ্যে যা কিনা খুব সুলভ নয়।

আমি নিজে অবশ্য ছবি খুবই কম দেখি। যে-ছবি সন্ত মুক্তি পেয়েছে, তাকে টাটকা-টাটকা দেখে নেব, এমন উৎসাহ আমার নেই। নেই, কেননা ভিড় ঠেলে আমি লাইন লাগাতে পারিনে। আমি দেখি নেহাতই দুটি-চারটি ছবি। তা-ও ধীরেসুস্থে; অবরে-সবরে। অর্থাৎ, মেট্রোর ছবি যখন মেটেবুরুজে গিয়ে পৌঁছয়, তখন। কিন্তু, দর্শক হিসেবে এত নিরুদ্যম হলে কী হয়, হল্ ওয়ালিসের অন্তত গুটি তিনেক ছবি আমি দেখেছি। তার মধ্যে একটির নাম আমার এখনও মনে আছে। 'কাম ব্যাক, লিট্‌ল্ শেবা'। অসাধারণ ছবি। এবং ও-ছবি যিনি তুলেছেন, সেই ওয়ালিসও যে একজন অসামান্য চিত্র-নির্মাতা, তাতে আমার সন্দেহ নেই।

সন্দেহ নেই চিত্র-সমালোচকদেরও। তার প্রমাণ, হল্ ওয়ালিসের

বিভিন্ন ছবি—বিভিন্ন কারণে—এ-যাবৎ প্রায় গুটি চল্লিশেক অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে।

আজকের এই গল্পটা কিন্তু ওয়ালিসকে নিয়ে নয়। এ-গল্পের যিনি নায়ক, তাঁর নাম রিকার্ডো কারাস্কো। অথচ মজা এই যে, কারাস্কোর কথা বলতে গেলেই ওয়ালিসের কথা বলতে হবে। তার কারণ, লক্ষ লোকের ভিড়ের মধ্যে ওয়ালিসই একদিন কারাস্কোকে খুঁজে পেয়েছিলেন। খুঁজে পেয়েছিলেন, কিন্তু ধরে রাখতে পারেননি।

প্রশ্ন উঠবে, কারাস্কো আবার কে? এ-প্রশ্নের উত্তর এখন দেব না। শুধু বলব যে, ওয়ালিসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল বড় অদ্ভুতভাবে। কোরিয়ায় যদি না যুদ্ধ লাগত—

কোরিয়ার কথা থাক। তার আগে আমি আরও দু-একটি কথা বলে নিতে চাই। প্রিয় পাঠক, দয়া করে একটু ধৈর্য ধরুন। আমি জানি যে, ব্যাপারটাকে আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছিনে, এবং ভূমিকাটাও একটু দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আর মাত্র মিনিট কয়েকের মধ্যেই আমি আসল গল্পে পৌঁছে যাব।

ওয়ালিসের ইচ্ছে হয়েছিল, যুদ্ধ নিয়ে তিনি একখানি ছবি তুলবেন। ঠিক যুদ্ধ নিয়ে নয়; যুদ্ধ আর যুদ্ধবিরতির, সংগ্রাম আর শান্তির সন্ধিলগ্ন নিয়ে। তাতে দেখাবেন, যুদ্ধ কত অকরুণ এবং মৃত্যু কত অকারণ হতে পারে। যুদ্ধে যারা মারা যায়, তাদের মৃত্যু অবশ্য—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই—অনাবশ্যক। কেননা, কী জন্যে যে তারা প্রাণ দিচ্ছে, তা তারা জানে না। তারা যে কোনও আদর্শের জন্যে লড়ছে, এমন না-ও হতে পারে; হয়ত-বা শুধুই আদেশ পালন করছে মাত্র। কিন্তু ওয়ালিস ঠিক সেদিক থেকে এই ব্যাপারটাকে দেখেননি। তিনি ভাবছিলেন এই রকমের একটা সময়ের কথা, একদিকে যখন যুদ্ধ এবং অন্যদিকে যখন যুদ্ধবিরতিব আলোচনা চলছে। তখনকার মৃত্যু ত আরও অকারণ। ঘণ্টা কয়েক বাদেই হয়ত যুদ্ধবিরতি ঘটবে; সে-কথা সবাই জেনেও গিয়েছে; অথচ, যুদ্ধবিরতির আদেশ

না-আসা পর্যন্ত যে-হেতু অস্ত্রসংবরণ সম্ভব নয়, তখনও সবাইকে লড়াই চালাতে হচ্ছে। অন্যকে মারতে হচ্ছে। নিজেকে মরতে হচ্ছে। ঠিক এইরকম একটি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই ওয়ালিস একখানি ছবি তুলতে চেয়েছিলেন।

কোথায় তুলবেন? কোরিয়ায় তখন যুদ্ধ চলেছে। ওয়ালিস ঠিক করলেন, স্টুডিওর মধ্যে সেট সাজিয়ে নয়, কোরিয়াতে গিয়েই ছবি তুলবেন। সময়টাও ছিল তাৎপর্যময়। কেননা যুদ্ধের নেপথ্যে কোরিয়ায় তখন শান্তির আলোচনাও চলছিল। সৈন্যরা তখন লড়ছিল বটে, কিন্তু তারা জানত, যে-কোন মুহূর্তেই যুদ্ধবিরতির আদেশ এসে যেতে পারে।

সপ্তাহ কয়েক পরের কথা। হলিউডের প্রজেকশান রুম-এর মধ্যে বসে আছেন হল্ ওয়ালিস। সামনে তাঁর রুপালি পর্দা। তাতে প্রতিফলিত হবে তাঁর সেই ফিল্ম-এর কয়েকটি দৃশ্য, কোরিয়ার রণাঙ্গনে বিস্তর অর্থব্যয় করে যা কিনা তোলা হচ্ছে। ছবির মধ্যে পেশাদার অভিনেতা একজনও নেই। বাস্তব জীবনের বাস্তব কয়েকটি মানুষকে নিয়েই এই ছবি। কাহিনীর মূল চরিত্র কয়েকটি মার্কিন সৈন্য। তারা শুনেছে, ঘণ্টাকয়েক বাদেই যুদ্ধবিরতি হবে। যুদ্ধবিরতি হলেই তারা দেশে ফিরবে। তাই নিয়েই গল্পগুজব করছে তারা। হঠাৎ খবর পাওয়া গেল, উত্তর কোরিয়ার একদল সৈন্য অকস্মাৎ এগিয়ে এসেছে, তাদের বাধা দিতে হবে। বাধা দিতে গিয়ে—যুদ্ধবিরতির মাত্র ঘণ্টা কয়েক আগে—কয়েকজন প্রাণ হারাল। সংক্ষেপে এই হল সেই ছবির কাহিনী।

ছবি দেখতে দেখতে চমকে উঠলেন হল্ ওয়ালিস। সত্যিকারের সেই সৈন্যদের মধ্যেই অল্পবয়সী একটি যুবকের অভিনয় দেখে তাঁর মনে হল, ঠিকমত যদি তালিম পায়, এ-ছেলে তবে বিশ্ববিখ্যাত নায়ক হয়ে উঠবে।

মনে হবার কারণ ছিল। হল্ ওয়ালিস আর-কিছু না চিনুন, অভিনেতা চেনেন। অসংখ্য অভিনেতাকে তিনি তাঁর নিজের হাতে তৈরি করে তুলেছেন; তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ বিশ্ববিখ্যাত। কে যে অভিনেতা হতে পারবে, আর কে যে পারবে না, মুখ দেখলেই তিনি তা বলে দিতে পারেন। কী করে পারেন? হল্ ওয়ালিস নিজেই সে-কথা জানিয়েছেন। বলেছেন, যে-মানুষ সত্যিকারের শিল্পী, তাকে দেখবামাত্রই তাঁর চিত্ত অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। এমন ব্যাপার এর আগেও অনেকবার হয়েছে। বলেছেন, "অনেক কাল আগে এডওয়ার্ড জি. রবিনসনকে দেখে আমার চিত্ত অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।"

রবিনসনকে তখন কেউ চিনত না।

বলেছেন, "এরল ফ্লীন, কার্ক ডগলাস আর বার্ট ল্যাঙ্কাস্টারকে দেখেও এই একই চাঞ্চল্য আমি অনুভব করেছিলাম।"

তাঁরাও তখন অখ্যাত মানুষ।

তারপর অনেকদিন আর ওয়ালিস সেই চাঞ্চল্য অনুভব করেননি। আজ করলেন। যুদ্ধের ছবির মধ্যে অখ্যাত অল্পবয়সী এক মার্কিন সৈন্যকে দেখে আজ আবার সেই একই চাঞ্চল্য অনুভব করলেন তিনি। তাঁর সন্দেহ রইল না যে, সুযোগ পেলে এ-ছেলেও একদিন বিশ্ববিখ্যাত চিত্র-তারকা হবে।

ছেলেটির নাম আপনারা আগেই শুনেছেন। রিকার্ডো কারাস্কো।

কারাস্কো কিন্তু বিশ্ববিখ্যাত চিত্র-তারকা হননি। বিশ্ববিখ্যাত দূরে থাক, অখ্যাত তারকাও তিনি হননি। কেন হননি, সেই কথাই এবারে বলব।

দোষটা ওয়ালিসের নয়। কারাস্কো যে একজন জাত-শিল্পী, সে-কথা বুঝবামাত্রই হল্ ওয়ালিস তাঁর সহকর্মীকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁকে বলেছিলেন, "কারাস্কোকে ছেড়ে দিও না; ওকে

দিয়ে একটি কনট্রাক্ট সই করিয়ে নাও। বলো যে, ওকে আমি হীরো করব।”

কোরিয়ায়, প্রায় তন্মুহূর্তেই, টেলিগ্রাম গেল। এবং হল্ ওয়ালিসও স্রেফ এই কথা ভেবেই নিশ্চিন্ত রইলেন যে, তাঁর প্রস্তাব শুনে কারাস্কো নিশ্চয়ই হতভম্ব হয়ে যাবে।

কারাস্কো কিন্তু হতভম্ব হয়নি। বরং ওয়ালিসই হতভম্ব হয়ে গেলেন। দিন কয়েক বাদে তাঁর সহকারী এসে জানালেন, কারাস্কো আর ছবিতে নামতে চায় না। সে আবার রণাঙ্গনেই ফিরে গিয়েছে।

“বলো কী! আমার প্রস্তাবটা তাকে জানানো হয়েছিল?”

“হয়েছিল। কিন্তু চুক্তিপত্রে সে স্বাক্ষর করতে চায়নি।”

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন হল্ ওয়ালিস। তারপর বললেন, “আশ্চর্য! সারা জীবন চেষ্টা করেও লোকে যেখানে ফিল্ম-এ নামবার চান্স পায় না, হীরো হবার সুযোগ পেয়েও সেখানে ও কিনা হাতের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলল। ব্যাপারটা বোধহয় ও বুঝতেই পারেনি। চিত্র-তারকা হলে যে ওর কপাল ফিরে যাবে, তা ও জানে না। ঠিক আছে; আর মাত্র সপ্তাহ কয়েকের মধ্যেই ত যুদ্ধ শেষ হয়ে যাচ্ছে; কারাস্কোও তখন দেশে ফিরবে। তখন আমি নিজেই ওকে বুঝিয়ে বলব।”

ছবিখানার যিনি পরিচালক, সেই ওয়েন ক্রাম্প ইতিমধ্যে—স্যুটিং-এর কাজ চুকিয়ে—কোরিয়া থেকে আমেরিকায় ফিরে এলেন। ওয়ালিসকে এসে জানালেন, “আপনার কেব্‌ল্ আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু আপনার প্রস্তাবে ওকে রাজী করানো গেল না। এমন সুযোগ যে জীবনে মাত্র একবারই আসে, এবং সুযোগটা গ্রহণ করলে যে ও রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাবে, এবং খ্যাতির সঙ্গে-সঙ্গে ঐশ্বর্যেরও যে তখন সীমা থাকবে না, এই সবই আমি ওকে বুঝিয়ে বলেছি। কিন্তু সমস্ত শুনেও ও রাজী হয়নি। আমার প্রতিটি কথার উত্তরে ও

শুধু শান্ত গলায় বলেছে, 'অসম্ভব। আমার বন্ধুরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিচ্ছে, আমি তখন গিয়ে হলিউডের আরামের মধ্যে আশ্রয় নেব, এ কখনো হতে পারে না।' ”

মাসখানেকের মধ্যেই যুদ্ধবিরতি হল। এবং যুদ্ধবিরতির দিন কয়েক বাদেই আবার ওয়ালিস তাঁর সহকারীকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, “ওহে, যুদ্ধ ত শেষ হল! এবারে ত আর ফিল্ম-এ নামতে কারাস্কোর কোন আপত্তি হবার কথা নয়। অ্যাদ্দিনে ও নিশ্চয়ই বাড়ি ফিরেছে। যাও, ওর বাড়িতে একবার যাও। গিয়ে বল যে, টাকার জন্যে ভাবনা নেই। যত টাকা চায়, আমি দেব। শুধু কনট্রাক্টে ও একটা সই করে দিক।”

কারাস্কোকে কিন্তু এ-বারেও রাজী করানো যায়নি। রাজী করাবার কোন উপায় ছিল না। তার কারণ, কোরিয়া থেকে সে আর তার স্বদেশে ফিরে আসেনি। যুদ্ধক্ষেত্রেই সে মারা গিয়েছিল।

মারা গিয়েছিল যুদ্ধবিরতির মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে।

(অক্টোবর, ১৯৬০)

একজোড়া জুতো

কলকাতার প্রায় প্রতিটি দীপশিখাকেই যখন ঘোমটা পরিয়ে রাখা হত, তীব্রকণ্ঠ সাইরেনের শব্দকে যখন একটা তাড়া-খাওয়া কুকুরের আর্তনাদের মতন শোনাত, এবং সেই মরণান্তিক আর্তনাদ শুনবামাত্রই যখন পথচারীরা গিয়ে ব্যাফ্‌ল-ওয়ালের আড়ালে এবং গৃহস্থেরা গিয়ে খাটের তলায় আশ্রয় নিতেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলির কথা আপনার মনে আছে কিনা, আমি জানিনে। যদি থাকে, তাহলে ১৯৪৪ সনের ৬ই জুন তারিখটিকেও আপনি হয়ত মনে রেখেছেন। মনে রেখেছেন এইজন্যে যে, মহাযুদ্ধের ইতিহাসে ওটি একটি স্মরণীয় দিন। ওই ৬ই জুন তারিখেই মিত্রপক্ষের সৈন্যরা একটি অসাধ্যসাধন করেছিল। ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে জার্মান-অধিকৃত ফ্রান্সের সমুদ্রতটে গিয়ে নেমেছিল। রচনা করেছিল সেকেণ্ড ফ্রণ্ট। এবং এ-কথাও হয়ত আপনার মনে আছে যে, সেকেণ্ড ফ্রণ্ট রচিত হবার পর থেকেই মহাযুদ্ধের মোড় ঘুরে গিয়েছিল। জার্মানদের পতন ঘটাতে, অতঃপর, মিত্রপক্ষের বিশেষ সময় লাগেনি।

৬ই জুন বিজয়-দিবস বা ভি-ডে নয়। কিন্তু ডি-ডে। ডে অব ডেলিভারেন্স। ৫ই জুন পর্যন্তও পশ্চিম য়োরোপের প্রতিটি ইঞ্চি জমি ছিল নাৎসীদের দখলে। ৬ই জুন থেকেই শুরু হল সেই সার্বিক দখলদারির অবসান-পর্ব। মিত্রপক্ষের সৈন্যেরা অতঃপর একটির-পর-একটি যুদ্ধে জিতেছে ; একটির-পর-একটি য়োরোপীয় ভূখণ্ডকে জার্মান-আধিপত্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে করতে জার্মানির হৃৎপিণ্ডের দিকে, বার্লিনের দিকে, এগিয়ে গিয়েছে তারা।

এ-সবই আপনি জানেন। শুধু জানেন না, মিত্রপক্ষের এই প্রায়-অবিশ্বাস্য সাফল্যের কারণ কী। তাঁদের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনীর

অদম্য জয়স্পৃহা? ফরাসী গুপ্তবাহিনীর মৃত্যুপণ মুক্তি-সংগ্রাম? মিত্রপক্ষীয় সর্বাধিনায়ক আইজেনহাওয়ারের নিখুঁত রণকৌশল? নাকি জার্মান সেনাপতি রুনস্টেড আর রোমেলের সেই পারস্পরিক ঈর্ষা, মহাযুদ্ধ শেষ হবার আগে পর্যন্ত যার খবর পাওয়া যায়নি?

না। বলা বাহুল্য, এর প্রত্যেকটাই এক-একটা কারণ ঘটে, কিন্তু ৬ই জুন তারিখে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যরা যে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে, প্রায় বিনা বাধায়, জার্মান-অধিকৃত ফ্রান্সের উপকূলে গিয়ে নামতে পেরেছিল, এর কোনোটাই তার আসল কারণ নয়।

আসল কারণ—একজোড়া জুতো।

প্রিয় পাঠক, আমি জানি যে, আপনি হাসছেন। কিন্তু, লেখক হিসেবে আমি যদিও আপনাদের কাছে বিশেষ পরিচিত নই, তবু আমাকে বিশ্বাস করুন আপনারা। বিশ্বাস করুন যে, আমি আপনাদের একটা আষাঢ়ে গল্প শোনাতে বসিনি। মিত্রপক্ষীয় সৈন্যবাহিনীর সেদিনকার সেই সাফল্যের আসল কারণ সত্যিই অন্য-কিছু নয়, একজোড়া জুতো। আরও বিশদ করে বলতে গেলে বলতে হয়, একজোড়া লেডিজ শু।

কিন্তু না, জুতোর কথা পরে বলব। তার আগে বরং আরও দু-একটা কথা সেরে নেওয়া যাক।

১৯৪৪ সন। লালফৌজের পাল্টা-প্রহারে নাৎসীরা তখন বিপন্ন হয়েছে বটে, কিন্তু তাদের শিরদাঁড়া তখনও ভেঙে যায়নি। যাতে ভেঙে যায়, তারই জন্যে তখন নাৎসী-বিরোধী শিবিরে প্রবল দাবি উঠেছে, য়োরোপে একটা দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হক। ওদিক থেকে লালফৌজ ঠেলা দিচ্ছে, এদিক থেকেও একটা ঠেলা দেবার ব্যবস্থা হক। নাৎসী-দমনের কাজটা তাতে সহজতর হবে।

যুক্তিটা ভাল। কিন্তু সেকেণ্ড ফ্রণ্ট খুলবার—য়োরোপের উপকূলরক্ষী জার্মান বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে ফ্রান্সের সমুদ্রতটে

গিয়ে নামবার—কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। মিত্রপক্ষ জানতেন, সোভিয়েট-ভূমিতে হিটলার যে-ভাবে পর্যুদস্ত হয়েছেন, তাতে ফ্রান্সের উপকূল থেকে ইংল্যাণ্ডের উপরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার ইচ্ছেটা তাঁর হৃদয় থেকে একেবারে মুছে গিয়েছে বটে, কিন্তু আত্মরক্ষার পরিকল্পনায় তিনি কোনো ত্রুটি রাখেননি। য়োরোপের উপকূলকে অতি শক্ত হাতেই তিনি পাহারা দেবেন। হিটলার নিজেও তার একটা আভাস দিয়েছিলেন। আমেরিকা যখন যুদ্ধে নামে, তার কিছুদিন বাদেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, য়োরোপের উত্তর-পূর্ব প্রান্ত থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত তিন হাজার মাইল দীর্ঘ সমুদ্রতট-বরাবর তিনি বিরাট বিরাট দুর্গ এবং ঘাঁটির একটি নিরবচ্ছিন্ন রক্ষা-প্রাচীর গড়ে তুলেছেন। অতঃপর তিনি বলেছিলেন, "আমার সুদৃঢ় সংকল্প, এই রক্ষা-প্রাচীরকে আমি দুর্ভেদ্য করে তুলব। এমন ব্যবস্থা করব, শত্রুরা যাতে এই প্রাচীরের গায়ে দাঁত বসাতে না পারে।"

বলা বাহুল্য, হিটলারের দাবিটা ছিল প্রায় অভ্রভেদী। যে-উপকূল তিন হাজার মাইল দীর্ঘ, রক্ষা-প্রাচীরের আড়ালে তাকে ঘিরে রাখা ত আর চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু হিটলারকে সে-কথা কে বোঝাবে। হ্যালডার বোঝাতে চেয়েছিলেন। জেনারেল ফ্রান্ৎস হ্যালডার তখন জার্মান হাইকমাণ্ডের বড়কর্তা। রক্ষা-প্রাচীরে তাঁর বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। কিন্তু তাঁর অনাস্থার কথাটা প্রকাশ পেতেই হিটলার তাঁকে এমন কড়া ধমক লাগিয়েছিলেন যে, হ্যালডার আর পালাতে পথ পাননি। বড়কর্তা হ্যালডারেরই যেখানে এই অবস্থা, মেজো সেজো এবং ছোটকর্তাদের পক্ষে সেখানে নীরব থাকাই নিরাপদ। তাঁরা, অতএব, নীরব ছিলেন।

এবং য়োরোপের উপকূল বরাবর সেই রক্ষা-প্রাচীর গড়ে তুলবার কাজও অতঃপর শুরু হয়ে গিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ টন কংক্রীট. লক্ষ লক্ষ টন ইস্পাত, লক্ষ লক্ষ মানুষের হাড়ভাঙা পরিশ্রম। সে এক

এলাহি কাণ্ড। কিন্তু হায়, যে-কাজ বিশ্বকর্মারও সাধ্যাতীত, কে সেই অসাধ্যসাধন করবে। ঝাড়া দুটি বচ্ছর কেটে যাবার পরেও দেখা গেল যে, পাঁচিলটা তখনও অসমাপ্ত রয়ে গিয়েছে।

মিত্রপক্ষ কি তা জানতেন না? অবশ্যই জানতেন। দু পক্ষেরই সংবাদ-সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল নিখুঁত। কোথায় কী হচ্ছে না-হচ্ছে, গুপ্তচরদের কল্যাণে দু পক্ষের কানেই —যথাসময়ে—তার খবর পৌঁছে যেত। মিত্রপক্ষের বড়কর্তারা, সুতরাং যথাসময়েই খবর পেয়েছিলেন যে, রক্ষা-প্রাচীর গড়ে তুলবার কাজটা ঠিকমত এগোয়নি। বলাবাহুল্য, এই শুভবার্তায় তাঁরা উল্লসিতও হয়েছিলেন। সেই উল্লাসের অবসান ঘটল ১৯৪৩ সনের শেষার্ধে, যখন শোনা গেল যে, আটলান্টিক ওয়াল অর্থাৎ হিটলারের সেই বহুবিঘোষিত রক্ষা-প্রাচীর পরিদর্শনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে ফিল্ড-মার্শাল রোমেলের হাতে। মিত্রপক্ষের সৈন্যরা যাতে পশ্চিম য়োরোপের জমিতে গিয়ে নামতে না পারে, জাহাজ থেকে সমুদ্রতটে নামবার আগেই যাতে ইংলিশ চ্যানেলের ঢেউয়ের মধ্যে তাদের দুরের মতন ডুবিয়ে মারা হয়, স্বয়ং রোমেলই তার ব্যবস্থা করবেন।

খবরটায় কি আতঙ্কের কিছু ছিল? অবশ্যই ছিল। কেন ছিল, তা জানতে হলে রোমেলের পরিচয়ও জানতে হয়।

রোমেল ছিলেন একজন অসাধারণ যোদ্ধা। জার্মান সেনাপতিদের মধ্যে অনেকেই অনেক সময় মিত্রপক্ষীয় সৈন্যবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করেছেন বটে, কিন্তু রোমেলের সঙ্গে তাঁদের অধিকাংশেরই কোন তুলনা হয় না। আফ্রিকার রণাঙ্গনে, একটার পর একটা যুদ্ধ জিততে জিততে, সাফল্যের যে বিস্ময়কর নজির তিনি গড়ে তুলেছিলেন, অনেকেরই তাতে মনে হয়েছিল যে, তাঁর জীবনে হয়ত পরাজয়ের স্থান নেই। তিনি যেন জেতবার জন্যই জন্মেছেন, এবং আমৃত্যু শুধু জিতেই যাবেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ওই আফ্রিকার

রণাঙ্গনেই, ইংরেজ সেনাপতি মণ্টগোমারির হাতে, তাঁকে মার খেতে হয়েছিল, কিন্তু তাঁর সুনাম তাতে নষ্ট হয়নি। মিত্রপক্ষ তাঁর নতুন নামকরণ করেছিলেন—'ডেজার্ট ফক্স'। তাঁর আক্রমণ ছিল বিদ্যুৎ-গতি, এবং তাঁর আঘাত ছিল মৃত্যুময়। বস্তুত, যদি বলি যে, 'মরুশৃগাল' রোমেলের নামোচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গেই মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের মেরুদণ্ডের উপর দিয়ে একটা আতঙ্কের স্রোত বয়ে যেত, বিন্দুমাত্র বাড়িয়ে বলা হবে না।

সেই রোমেল এলেন ফ্রান্সের উপকূলে। এবং তাঁর আগমনের সঙ্গে-সঙ্গেই যেন জার্মান প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থায় একটা নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হল। এ হল ১৯৪৩ সনের নভেম্বর মাসের কথা। পশ্চিম য়োরোপের জার্মান সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক তখন ভন রুনস্টেড। কিন্তু বার্লিন থেকে যে নির্দেশপত্র নিয়ে এলেন রোমেল, তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল যে, মিত্রপক্ষের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধে রোমেলই হবেন সর্বময় কর্তা; বৃদ্ধ রুনস্টেডের কোনো কর্তৃত্ব সেখানে খাটবে না। রোমেল গিয়ে সমুদ্রতটের সেই রক্ষা-প্রাচীর পরিদর্শন করবেন, এবং মিত্রপক্ষের আক্রমণকে প্রতিহত করবার জন্যে যা-কিছু ব্যবস্থা করা দরকার, রুনস্টেডকে নয়, সরাসরি হিটলারকে জানিয়েই সেই ব্যবস্থা তিনি অবলম্বন করবেন। রুনস্টেড যে হিটলারের বিষ-নজরে পড়েছেন, এবং বৃদ্ধ রুনস্টেডের (তাঁর বয়স তখন আটষট্টি) চাইতে প্রৌঢ় রোমেলের (তাঁর বয়স তখন একান্ন) কথার দাম যে অনেক বেশী, অতঃপর আর সে-বিষয়ে কারও কোন সন্দেহ রইল না।

সন্দেহ রইল না আর-একটা ব্যাপারেও। সেটা হল এই যে, সেকেণ্ড ফ্রন্ট খোলবার জন্য, আজই হক আর কালই হক, মিত্রপক্ষের সৈন্যরা এসে ফ্রান্সের উপকূলে হানা দেবেই। সেই লগ্নটা ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে। এ-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ ছিল না প্রধানত এই জন্য যে, ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ উপকূলে ইতিমধ্যে বিপুলভাবে

সৈন্য-সমাবেশ করা হচ্ছিল, এবং ইংল্যাণ্ড থেকে প্রচারিত সাংকেতিক বেতার-বার্তার পরিমাণও ইতিমধ্যে নিদারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই বেতার-বার্তাগুলি প্রচারিত হচ্ছিল ফরাসী গুপ্তবাহিনীর উদ্দেশ্যে। জার্মান গোয়েন্দা-বিভাগ বুঝতে পেরেছিলেন যে, অকস্মাৎ এইভাবে রাশি-রাশি বেতার-বার্তা প্রচারের উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, জার্মান-অধিকৃত ফ্রান্সের ভিতর গোপনে যে-সব দেশপ্রেমিক নরনারী তাঁদের দেশের জন্য মুক্তিসংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, য়োরোপের সমুদ্রতটে অভিযান চালাবার আগে মিত্রপক্ষ তাঁদের সজাগ করে দিতে চান।

এবারে একটা চমকপ্রদ কথা শুনুন। মিত্রপক্ষের সৈন্যরা যে ঠিক কবে তাদের অভিযান চালাবে, জার্মান গোয়েন্দা-বিভাগ তারও একটা সুস্পষ্ট আভাস পেয়েছিলেন। জার্মান গোয়েন্দা-বিভাগের বড়কর্তা অ্যাডমিরাল উইল্‌হেল্‌ম ক্যানারিস জানতেন যে, অভিযান শুরু হবার আগে—ফরাসী গুপ্তবাহিনীকে সে-কথা জানিয়ে দেবার জন্য—ইংলণ্ডের বেতার-প্রতিষ্ঠান বি-বি-সি থেকে একটা বিশেষ সাংকেতিক বার্তা প্রচারিত হবে। সেই সাংকেতিক বার্তাটা হল উনিশ শতকের সুবিখ্যাত ফরাসী কবি ভের্লেনের অতি-পরিচিত একটি কবিতার অতি-পরিচিত দুটি লাইন। কবিতাটির নাম 'Chanson d' Automne' অর্থাৎ 'শরতের গান'। এবং লাইন দুটি হল:

Les sanglots longs des violons de l'automne
Blessent mon coeur d'une langueur monotone.

(অর্থাৎ: "শরতের বেহালার একটানা কান্না
আমার হৃদয়ে একটা ক্লান্তিহীন অবসাদ হানছে।"

ফরাসী কবিতাটির শুধু বাংলা তর্জমা দিলেই চলত। তবু যে মূল ফরাসী তুলে দিলাম, তার কারণ, বি-বি-সি থেকে মূল ফরাসীই প্রচারিত হয়েছিল।)

জার্মান গোয়েন্দা-বিভাগ এ-কথাও জানতেন যে, কোনো মাসের ১লা অথবা ১৫ই তারিখে এই কাব্যাংশের প্রথম লাইনটি (Les

sanglots longs des violons de l'automne) বি-বি-সি থেকে প্রচারিত হবে। অতঃপর—তার দিন কয়েক বাদে —দ্বিতীয় লাইনটি (Blessent mon coeur d'une langueur monotone) প্রচারিত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই বুঝতে হবে যে, অভিযান প্রত্যাসন্ন। মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ফ্রান্সের উপকূলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

গোয়েন্দা-তৎপরতার ত আভাস দিলাম। এখন বলি, রোমেল আসবার পর উপকূল-প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাতেও কোন ত্রুটি ছিল না। রোমেল ছিলেন নিখুঁত কাজের পক্ষপাতী। অসমাপ্ত রক্ষা-প্রাচীরের উপরে তিনি আস্থা রাখেননি। ফ্রান্সের উপকূলে তিনি ৫০ লক্ষ মাইন পেতে রেখেছিলেন। মিত্রপক্ষীয় ট্যাঙ্কগুলিকে জাহাজ থেকে সমুদ্রতটে নামিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি যাতে অকর্মণ্য হয়ে যায়। মাইন, মাইন আর মাইন। তা ছাড়া অন্যান্য রকমের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা ত ছিলই। আর সেই প্রতিরোধ-ব্যূহের ঠিক পিছনেই ছিল তাঁর সুদক্ষ বাহিনী, শৌর্য এবং পরাক্রমে তখন য়োরোপে যাদের তুলনা ছিল না। এবং প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে এই ভাবে সম্পূর্ণ করে তুলেই ফিল্ড-মার্শাল রোমেল তখন তাঁর জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি মুহূর্তের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। প্রতীক্ষা করছিলেন সেই মৃত্যুপণ সংগ্রামের, মিত্রপক্ষীয় সৈন্যবাহিনী এসে য়োরোপের সমুদ্রতটে নামবামাত্রই যা শুরু হয়ে যাবে।

১৯৪৩ সন শেষ হয়ে গেল। এল ১৯৪৪ সনের জানুয়ারি। জানুয়ারি গেল, ফেব্রুয়ারি গেল, মার্চ গেল, এপ্রিল গেল, মে-ও যায় যায়। কিন্তু, অবাক কাণ্ড, তখনও সেই সংকেত-বার্তা পাওয়া গেল না।

রোমেল এদিকে অস্থির হয়ে উঠছিলেন। অস্থির এবং ক্লান্ত। তাঁর মনে হচ্ছিল, অভিযান শুরু হতে আরও অনেক দেরি হবে।

ইতিমধ্যে একবার বার্লিন থেকে ঘুরে এলে কেমন হয়। অনেক দিন তিনি ছুটি নেননি, লুসিকে দেখেননি। লুসি-মারিয়া তাঁর স্ত্রী। ওঃ হো, মে মাস ত শেষ হয়ে গেল। আর মাত্র হপ্তাখানেক। হপ্তাখানেক বাদেই ৬ই জুন। লুসির জন্মদিন। লুসির জন্মদিনে তিনি দূরে থাকবেন ?

রোমেল সত্যিই অস্থির হয়ে উঠেছিলেন।

১লা জুন, ১৯৪৪। জার্মান গোয়েন্দা-বিভাগের জুনিয়র-অফিসার ওয়াল্টার রাইখলিং তাঁর বেতার-যন্ত্রের সামনে বসে ছিলেন, এবং বি-বি-সি থেকে প্রচারিত খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি শব্দই অতি নিবিষ্ট চিত্তে তিনি শুনে যাচ্ছিলেন। রাত নটায় বি-বি-সি থেকে খবর বলা হল। খবর বলা শেষ হবার পর ঘোষক বললেন, “এবার কয়েকটি ব্যক্তিগত খবর আছে। দয়া করে শুনুন।” তারপর এক মুহূর্তের বিরতি। এবং তারপর…

“Les sanglots longs des violons de l'automne—”

প্রথমে কিছু বুঝতে পারেননি রাইখলিং। তারপর বুঝলেন। এবং বুঝবামাত্রই তাঁর শরীরের মধ্যে দিয়ে যেন একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটে গেল। এসেছে! সাংকেতিক যে বার্তাটাকে শোনবার জন্য তাঁর বেতার-যন্ত্রের সামনে বসে রাতের পর রাত জেগে কাটিয়েছেন তিনি, সেই ভয়ংকর বার্তাটাই এবার এসেছে! রাইখলিং প্রায় উন্মাদের মতন ছুটে বেরিয়ে গেলেন তাঁর ঘর থেকে।

আক্রমণ-সঙ্কেতের প্রথম লাইনটা যে বি-বি-সি থেকে প্রচারিত হয়েছে, রাইখলিং তা তন্মুহূর্তেই তাঁর উর্ধ্বতন অফিসার লেফটেন্যাণ্ট-কর্নেল হেলমুট মেয়ারকে গিয়ে জানিয়েছিলেন, এবং মেয়ারও সেই খবরটাকে তৎক্ষণাৎ ফিফটিন্থ আর্মির চীফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল উইলহেল্ম হফম্যানের কাছে পৌঁছে দিতে কোনও

গাফিলতি করেননি। শুধু তা-ই নয়, খবরটাকে মেয়ার অতঃপর টেলিপ্রিণ্টারযোগে হিটলারের হেডকোয়ার্টার্সে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর একে-একে রুনস্টেড আর রোমেলের হেডকোয়ার্টার্সে ফোন করে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, আক্রমণ-সঙ্কেতের প্রথম লাইনটা তিনি পেয়ে গিয়েছেন।

পরবর্তী ঘটনাবলী যেমনই অস্বাভাবিক, তেমনই বিস্ময়কর। হিটলারের হেডকোয়ার্টার্সে চীফ অব অপারেশন্স জেনারেল আলফ্রেড জোড্ল-এর কাছে এই আক্রমণ-সঙ্কেতের খবর পৌঁছনো সত্ত্বেও জার্মান প্রতিরক্ষা-বাহিনীকে তিনি সতর্ক করে দিলেন না। তিনি ভাবলেন, রুনস্টেডই তা করবেন। এদিকে রুনস্টেডও স্রেফ হাত গুটিয়ে বসে রইলেন এই ভেবে যে, এ-ব্যাপারে যা-কিছু করবার, তা রোমেলই করবেন।

অদৃষ্টের পরিহাস, রোমেলও তাঁর সৈন্যবাহিনীকে সতর্ক করে দিলেন না।

কেন দিলেন না? মহাযুদ্ধের ইতিহাসে তার উত্তর নেই। তবে অনুমান করা হয়, রোমেল হয়ত এই আক্রমণ-সঙ্কেতের ব্যাপারটাকে মোটেই আমল দেননি। হয়ত ভেবেছিলেন, এটা একটা ধাপ্পার ব্যাপার।

পাঠক, আমি জানি যে, আপনি অস্থির হয়ে উঠেছেন। ভাবছেন, তা তো বুঝলাম, কিন্তু সেই জুতোজোড়ার কী হল?

আসবে, এইবারেই সেই জুতোর খবর আসবে। তার আগে আর দু-একটা মাত্র কথা বলে নেওয়া দরকার।

৫ই জুন, ১৯৪৪। বি-বি-সি থেকে সেই আক্রমণ-সঙ্কেতের প্রথম লাইনটি প্রচারিত হবার পর পুরো সাতানব্বই ঘণ্টা যে দুঃসহ উদ্বেগ নিয়ে কাটিয়েছেন জার্মান গোয়েন্দা-অফিসার লেফটেন্যাণ্ট-

কর্নেল মেয়ার, ৫ই জুন রাত দশটা কুড়িতে তার অবসান হল। বেতার-যন্ত্রে ভেসে উঠল "শরতের গান" কবিতার সেই দ্বিতীয় লাইনটি :

"Blessent mon coeur d'une langueur monotone."

মেয়ার বুঝলেন, আক্রমণ প্রত্যাসন্ন। পরবর্তী আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ফ্রান্সের সমুদ্রতটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আগেই বলেছি, আক্রমণের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া সত্ত্বেও জার্মান প্রতিরক্ষা-বাহিনীকে ইতিপূর্বে কেউ সতর্ক করে দেয়নি। এবং জার্মান বাহিনীর সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে অনেকে তাই তখন ছুটিতে ছিলেন। সবচাইতে মারাত্মক কথা, স্বয়ং রোমেলই তখন রণাঙ্গনে ছিলেন না।

কোথায় ছিলেন রোমেল? বার্লিনে। ১লা জুন তারিখেই তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, আক্রমণ-সঙ্কেতের প্রথমাংশ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু আগেই বলেছি, সেই সঙ্কেতের উপরে তিনি কোনো গুরুত্ব আরোপ করেননি। ৪ঠা জুন সকালে মোটরযোগে তিনি রণাঙ্গন থেকে বিদায় নেন। বার্লিন অভিমুখে যাত্রা করেন।

তখন তাঁর সঙ্গে ছিল একজোড়া জুতো। সাদা চামড়ার অতি সুন্দর এক জোড়া লেডিজ শূ। তাঁর স্ত্রীর জন্মদিনের উপহার।

জন্মদিন উপলক্ষ্যে লুসি-মারিয়াকে একটা কিছু উপহার দেওয়া দরকার। রোমেল তাই রণাঙ্গনের মধ্যে, অনেক কষ্টে, এই জুতো-জোড়াকে সংগ্রহ করেছিলেন। এবং অনুমান অসঙ্গত নয় যে, সুন্দর এই উপহারটি সংগ্রহ করতে না-পারলে হয়ত শেষ পর্যন্ত তিনি বার্লিনে যেতেন না।

প্রিয় পাঠক, আমি জানি যে, এই তথ্যগুলি প্রায় গালগল্পের

মতন শোনাচ্ছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, পাঠকদের একটা আষাঢ়ে গল্প শোনাবেন, কর্নেলিয়াস রায়ানের এমন কোনো লঘু অভিপ্রায় ছিল না। রায়ান একজন বিখ্যাত সাংবাদিক। ইংলিশ চ্যানেলের এ-পারে এবং ও-পারে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে তিনি দেখা করেছেন, অজস্র তথ্য সংগ্রহ করেছেন। অতঃপর সেই তথ্যের ভিত্তিতে, ডি-ডে সম্পর্কে, অতি সুন্দর এবং নির্ভরযোগ্য একখানি বই লিখেছেন তিনি। বইটির নাম 'দি লংগেস্ট ডে'। বর্তমান রচনায় সেই গ্রন্থ থেকে কিছু তথ্য আমি নিয়েছি। তবে, বলা বাহুল্য, মূল গ্রন্থের স্বাদ আরও অনেক বেশী সুন্দর, এবং আবহাওয়া আরও অনেক বেশী উত্তেজনাময়। বস্তুত, মহাযুদ্ধ সম্পর্কে যে-সব বই এ-যাবৎ লেখা হয়েছে, 'দি লংগেস্ট ডে' যে তার মধ্যে একটি সেরা রচনা, তাতে সন্দেহ নেই।

এখন বলি, এ-গল্পের সমাপ্তির পরেও আবার দ্বিতীয় একটি সমাপ্তি আছে। কিছুদিন আগে, আমেরিকার এক কাগজে, 'দি লংগেস্ট ডে'-র এক সমালোচনা বেরিয়েছিল। সমালোচক তাতে প্রশ্ন তুলেছিলেন, যে-জুতো নিয়ে এত কাণ্ড, সেই জুতোজোড়ার শেষ পর্যন্ত কী হল, কর্নেলিয়াস রায়ান তা জানাননি কেন।

সমালোচনার উত্তরে রায়ান একখানি চিঠি লেখেন। চিঠিখানি ওই মার্কিনী পত্রিকাতেই বেরিয়েছিল। রায়ান তাতে জানিয়েছেন যে, রোমেলের স্ত্রী লুসি-মারিয়ার সঙ্গে তিনি দেখা করেছিলেন। কিন্তু, স্বামীর নামে পাছে একটা অপবাদ রটে, তাই জুতোর ব্যাপারটাকে ফ্রাউ রোমেল প্রথমে স্বীকারই করতে চাননি। পরে অবশ্য তিনি বুঝতে পারেন যে, রায়ান এ-ব্যাপারে এতসব তথ্য যোগাড় করেছেন যে, অস্বীকার করে কোনো লাভ হবে না।

রায়ানের সামনে থেকে উঠে গিয়ে সেই ঐতিহাসিক জুতোজোড়াকে তিনি তখন নিয়ে এসেছিলেন। মুহূর্তের স্তব্ধতা। তারপর রায়ানের সামনে সেই জুতোজোড়া এগিয়ে দিয়ে, ধীর শান্ত গলায় তিনি বলেছিলেন, "এত সুন্দর জুতো বোধহয় আর কখনও আমি পরিনি।"

(জুলাই, ১৯৬০)

ক্যারিলের মৃত্যু

পুরো এক যুগ ধরে মৃত্যুকে যিনি ঠেকিয়ে রেখেছিলেন, গত ২রা মে—ভারতীয় সময় রাত সাড়ে দশটায়—তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। মৃত্যু ঘটেনি তাঁর আপন গৃহে, অথবা হাসপাতালে, অথবা রাজপথের কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনায়। মৃত্যু ঘটেছে আমেরিকার এক কারাগারে—দৃশ্যমান বিশ্ব-সংসারের পরিধি একদিন নিমেষে সঙ্কুচিত হয়ে গিয়ে যেখানে দৈর্ঘ্যে সাড়ে দশ ফুট এবং প্রস্থে সাড়ে চার ফুট একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে এসে সীমাবদ্ধ হয়েছিল। জীবন-মৃত্যুর সেই সন্ধিলগ্নে তাঁর বিক্ষুব্ধ জীবনের সমস্ত প্রতিবাদ অকস্মাৎ শান্ত হয়ে গিয়েছিল কিনা, নাকি তাঁর দৃষ্টি তখনও ক্রোধে জ্বলছিল, জানবার উপায় নেই। কেননা, ক্যারিল তখন তাঁর মৃত্যুকক্ষে আবদ্ধ। না, গত বারো বছরে যিনি চার-চারটি বেস্ট-সেলার লিখেছেন (যার অন্তত একটির তর্জমা আজ অন্তত বারোটি ভাষায় সংগ্রহ করা সম্ভব), আত্মীয়-পরিবৃত রোগশয্যায় অথবা ডাক্তারে-নার্সে পরিবৃত অপারেশন টেবিলে মারা যাবেন, এমন স্বাভাবিক ভাগ্য নিয়ে তিনি জন্মাননি। সান কুয়েন্টিন কারাগারের গ্যাস-চেম্বারে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে।

অথচ, এই অস্বাভাবিক মৃত্যু যাতে না ঘটে, ক্যারিল চেসম্যানের নিজের ত বটেই, আরও অসংখ্য মানুষের সেজন্যে চেষ্টার অন্ত ছিল না। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিবও তা খুব ভালই জানতেন। গত মার্চ মাসে তাঁর এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেছিলেন, “চেস্‌ম্যান সম্পর্কে দক্ষিণ আমেরিকায় খুবই উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।”

কথাটা অবশ্য অংশত সত্য। কেননা, উদ্বেগ শুধু দক্ষিণ আমেরিকাতেই দেখা দেয়নি। দেখা দিয়েছিল সর্বত্র। আটলান্টিকের পূর্বতটে, লণ্ডনের ডেলি হেরাল্ড পত্রিকায় এ সম্পর্কে মন্তব্য করা

হয়েছিল, "ক্যারিল যেদিন মৃত্যুবরণ করবেন, মার্কিন নাগরিক হওয়াটা সেদিন অনেকের পক্ষেই ঈষৎ অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াবে।" নিউজ ক্রনিক্‌ল পত্রিকায় বলা হয়েছিল, "চেসম্যানের যন্ত্রণা, বস্তুত, আমেরিকার পক্ষে একটা গ্লানির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

আমেরিকার কাগজগুলিতেও এ সম্পর্কে বিস্তর চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। চেসম্যানের বিপক্ষে এবং সপক্ষে। সপক্ষে যাঁরা চিঠি লিখেছিলেন, তাঁদের সংখ্যা নেহাৎ সামান্য নয়। তাঁরা অনুরোধ জানিয়েছিলেন, "ক্যারিলকে নিষ্কৃতি দাও।" তা ছাড়া পশ্চিম ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা আর অস্ট্রেলিয়া থেকে অসংখ্য টেলিফোন এসেছে ক্যালিফর্নিয়ার গভর্নর এডমণ্ড ব্রাউনের কাছে। "ক্যারিলকে ক্ষমা করুন।" অনুরোধ এসেছে বেলজিয়ামের রানী-মা আর ইতালির চেম্বার অব ডেপুটিজ-এর সোস্যাল ডেমোক্রাট সদস্যদের কাছ থেকেও। "ক্যারিলকে রেহাই দিন।" মৃত্যুর মাত্র দিন কয়েক আগে যিনি ক্যারিলের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, গ্রীসের সেই রাজকুমারী মারিও সেদিন স্পষ্ট ভাষায় জানালেন, "বারো বছর যাঁর মাথার উপরে মৃত্যুর খড়গ ঝুলেছে, তাঁকে আর মৃত্যুদণ্ড দেবার কোন অর্থ হয় না। তবু যদি ক্যারিলকে মরতে হয়, সমগ্র বিশ্বেই তাহলে বিক্ষোভের ঝড় উঠবে।"

ক্যারিলকে নিয়ে ইতিমধ্যে, ইউরোপ এবং আমেরিকায়, গানও বাঁধা হয়েছিল কয়েকটি। তার একটির নাম "দি ব্যালাড অব ক্যারিল চেসম্যান।" গানের প্রথম লাইন, "লেট হিম লিভ, লেট হিম লিভ, লেট হিম লিভ।" বাঁচতে দাও, ওকে বাঁচতে দাও, ওকে বাঁচতে দাও। ক্যারিলকে তবু বাঁচানো গেল না। তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন। শুধু বাঁচতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু ক্যালিফর্নিয়ার অন্ধ আইন তাঁকে বাঁচতে দেয়নি। আইন তাঁকে সেদিন মৃত্যুর হাতে তুলে দিয়েছে।

ভাবতে অবাক লাগে, আজ থেকে প্রায় বছর তিরিশেক আগে ব্রুনো হফ্‌টম্যান নামক একটি তস্কর যদি না একদিন বিশ্ববিখ্যাত বৈমানিক কর্নেল লিণ্ডবার্গের শিশুপুত্রটিকে অপহরণ করত, ক্যারিল চেসম্যানকে তাহলে গ্যাসচেম্বারে গিয়ে মরতে হত না। কিন্তু পরোক্ষ সেই যোগাযোগের কথাটা বলবার আগে বরং ক্যারিলের সম্পর্কে দু-একটা জরুরী কথা বলে নেওয়া যাক।

ক্যারিলের আসল নাম ক্যারল। ক্যারলকে যে তিনি ক্যারিল বানিয়েছিলেন কেন, তা কেউ জানে না। তাঁর শৈশব কেটেছে লস এঞ্জেল্‌সে। বাবা ছিলেন অস্থিরচিত্ত মানুষ। ছুতোর, কসাই, রাজমিস্ত্রী—একটার পর একটা কাজ নিয়েছেন তিনি, এবং ছেড়ে দিয়েছেন। ভদ্রলোকের স্বাস্থ্য কখনও ভাল যায়নি। তাঁর যৎসামান্য আয়েরও একটা বড় অংশ তাই কেমিস্ট অথবা ডাক্তারের পকেটে গিয়ে উঠত। ক্যারিলের মা-ও ছিলেন পঙ্গু। ছেলের বয়স যখন ন বছর, মা তখন এক মোটর-দুর্ঘটনায় আহত হন। বাকী জীবনটা তাঁকে ইনভ্যালিড-চেয়ারে বসে কাটাতে হয়েছে। ছেলের যত্ন তিনি কোনদিনই নিতে পারেননি।

অযত্নে অযত্নে ক্যারিলের জীবনও ক্রমে শুকিয়ে যাচ্ছিল। হাঁপানি, সর্দি, কাশি—অসুখের আর অন্ত ছিল না। সবচাইতে বড় অসুখ দারিদ্র্য। বিস্ময়ের ব্যাপার, দারিদ্র্য তাঁর মস্তিষ্ককে কখনও গ্রাস করতে পারেনি। লেখাপড়ায় তাঁর সুনাম ছিল। দুর্নাম ছিল অন্যান্য ব্যাপারে। তাঁর অহঙ্কার ছিল অসামান্য। এই অহঙ্কারই তাঁকে অন্যান্য ভাল ছেলেদের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। নীচে টেনে নামিয়েছে। নীচের তলার বন্ধুরা তাঁকে মোটর চুরি করতে শেখাল। ক্যারিলের বয়স তখন চোদ্দ। বড়জোর পনর।

ষোল বছর বয়সে প্রথম ধরা পড়লেন তিনি। কিন্তু লস্‌ এঞ্জেল্‌সের সংশোধনাগারে তাঁকে আটকে রাখা গেল না। জানলা ভেঙে তিনি বাইরে, একটা লরির উপরে, লাফিয়ে পড়লেন। লরি

চালিয়ে সোজা চলে গেলেন পাঁচিলের কাছে। পুলিস ছুটে এসেছিল। কিন্তু ক্যারিল ততক্ষণে পাঁচিল টপকে পালিয়েছেন। ক্যারিলকে অবশ্য পরের দিনই আবার গ্রেপ্তার করা হল। একটা ড্রাগস্টোর লুঠ করতে গিয়েছিলেন তিনি। সেইখানেই তিনি ধরা পড়েন। এর পরবর্তী যে ইতিহাস, তা শুধু লুঠপাট, কারাবাস, কারামুক্তি এবং পুনরায় কারাবাসের ইতিহাস।

আসল ঘটনাটা ১৯৪৮ সনে ঘটল। লস এঞ্জেল্সের শহরতলি-অঞ্চলে তখন এক প্রবল আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। সকলের মুখেই এক কথা। কে একটা মানুষ নাকি একখানা ধূসর রঙের ফোর্ড গাড়ি চালিয়ে লস্ এঞ্জেল্সের যত অন্ধকার গলির মধ্যে গিয়ে হানা দিচ্ছে, এবং—নির্জন পথে গাড়ি থামিয়ে যারা প্রেমালাপ করে, সেই কপোত-কপোতীদের মুখের উপর পিস্তল উঁচিয়ে—লুঠপাট চালাচ্ছে। শুধু তাই নয়, দু দুটি মেয়েকে সে নাকি জোর করে তার নিজের গাড়িতে এনে তুলেছিল ; তাদের উপরে বলপ্রয়োগ করেছিল। (একটি মেয়ে পরে পাগল হয়ে যায়।) এর দিনকয়েক বাদেই একদিন লস এঞ্জেল্সের পুলিস-প্রহরীদের উদ্দেশে এক জরুরী বেতার-নির্দেশ প্রচারিত হল : "ফোর্ডে চড়ে দুজন ডাকাত পালাচ্ছে। দেখতে পেলেই আটক করো।" তার খানিক পরেই দুজন পুলিস-প্রহরী দেখতে পায় যে, ধূসর রঙের একখানা ফোর্ডগাড়ি প্রায় বিদ্যুৎবেগে তাদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ তাড়া করা হল সেই গাড়িখানিকে। তাড়া করে তাকে আটকানোও হল। এবং আটকাবার পরে দেখা গেল যে, সেই ফোর্ডগাড়ির চালক আর কেউ নয়, ক্যারিল চেসম্যান।

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আদালতে অতঃপর প্রমাণ করবার চেষ্টা হয়েছে যে, ক্যারিল চেসম্যানই সেই দস্যু, লস্ এঞ্জেলসের নির্জন গলিতে টর্চের আলোর আতঙ্ক জাগিয়ে যে ঘুরে বেড়াত, প্রেমিক-প্রেমিকাদের উপরে গিয়ে হামলা করত, এবং অসহায় দুটি মেয়েকে যে

তার নিজের গাড়িতে এনে তুলেছিল। শেষের কাজটা কিডন্যাপিংয়ের পর্যায়ে পড়ে।* কিডন্যাপিং উইথ বডিলি হার্ম। ক্যালিফর্নিয়ায় যার শাস্তি হল মৃত্যু।

একটু আগেই আমি বলেছি, আজ থেকে প্রায় বছর তিরিশেক আগে ব্রুনো হফ্‌ট্‌ম্যান নামক একটি তস্কর যদি না একদিন বিশ্ববিখ্যাত বৈমানিক কর্নেল লিণ্ডবার্গের শিশুপুত্রকে হরণ করত, ক্যারিলকে তাহলে গ্যাস-চেম্বারে গিয়ে মরতে হত না। কথাটা আমি অকারণে বলিনি। বস্তুত, লিণ্ডবার্গকে সবাই এত বেশী ভালবাসত যে, তাঁর ছেলে চুরি যাবার পরেই হঠাৎ আমেরিকার জনমত এ-ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, এবং জনসাধারণের দাবি অনুযায়ী সেদিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে প্রচলিত দণ্ডবিধির সংশোধন করতে হয়। সংশোধিত হয় ক্যালিফর্নিয়ার দণ্ডবিধিও। নতুন দণ্ডবিধিতে জানানো হল যে, কিডন্যাপিংয়ের শাস্তি মাত্র কয়েক বছরের কারাবাস নয়, মৃত্যু। লস্‌ এঞ্জেলসের সেই মেয়ে দুটির সাক্ষ্যের উপরে নির্ভর করে বিচারক ফ্রীক তাই যখন সাব্যস্ত করলেন, ক্যারিল তাদের অপহরণ এবং প্রহার করেছিল, তখনই বোঝা গেল যে, ক্যারিলকেও সেই চরম দণ্ডই দেওয়া হবে।

চরম দণ্ডই দেওয়া হল। কিন্তু দণ্ডিত মানুষটিকে যে তক্ষুনি গ্যাস-চেম্বারে পাঠানো গেল না, তার কারণ, ক্যারিল ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমান। এবং তাঁর জীবনতৃষ্ণাও ছিল অসামান্য। তিনি যে নির্দোষ, এই কথাটাকে প্রমাণ করবার জন্যে, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবার পরেও সুদীর্ঘ বারো বছর তিনি আইনের লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন। কখনও তিনি আইনের ত্রুটি ধরেছেন, কখনও-বা বিচার-ব্যবস্থার। কখনও-বা বলেছেন, সাক্ষ্যপ্রমাণে ত্রুটি ছিল। ত্রুটি ছিল না তাঁর যুক্তিতে। ফলে ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে দিতে হয়েছে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের তারিখ। একবার দুবার নয়, আটবার। দণ্ডদাতা

ফ্রীক ইতিমধ্যে মারা গিয়েছেন, এবং দণ্ডিত আসামী ক্যারল ইতিমধ্যে চার-চারখানি বেস্ট-সেলার লিখেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর অনুকূলে—স্বদেশে এবং বিদেশে—প্রবল একটি জনমত গড়ে তুলতেও তাঁর অসুবিধে হয়নি। নিবন্ধের সূত্রপাতেই তার আভাস দিয়েছি।

কিন্তু, অনুমান করতে পারি, ক্যারিল ইদানীং ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর উক্তি থেকে অন্তত তাই মনে হয়। গত মার্চ মাসে তাঁকে যখন জানানো হল যে, জুডিসিয়ারী কমিটির বৈঠকে প্রাণদণ্ড-প্রথা মুলতুবি রাখবার প্রস্তাব ৮-৭ ভোটে নাকচ হয়ে গিয়েছে, ক্যারিল তখন বলেছিলেন, আটবার ত গ্যাসচেম্বারকে ফাঁকি দিলাম; আর কত দেব। "I do not want to be credited with more lives than a cat."

ক্লান্ত সেই মার্জারটির সেদিন মৃত্যু ঘটেছে। এবং মার্লন ব্রাণ্ডো জানিয়েছেন, ক্যারিলকে নিয়ে তিনি একখানি ছবি তুলবেন।

ক্যারিল সত্যিই দোষী ছিলেন কি না, বলা সম্ভব নয়। হয়ত ছিলেন। হয়ত ছিলেন না। সাক্ষ্য-প্রমাণে তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। তাঁর অতীত অন্ধকার। কিন্তু এমনও সম্ভব যে, অতীত এত অন্ধকার ছিল বলেই হয়ত অনায়াসে একটি মিথ্যা-মামলায় তাঁকে জড়িত করা গিয়েছিল।

ক্যারিলের মৃত্যুতে অনেকে খুশী হয়েছেন। আমি হইনি। আমি শুধু একটি কথাই ভাবছি। ভাবছি যে, যে-মানুষটা বাঁচতে—শুধু বেঁচে থাকতে—চেয়েছিল, তার নিজেরই অতীত তাকে বাঁচতে দিল না। ভবিষ্যতের আলোর দিকে সে তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। অতীতের অন্ধকার তাকে পিছনে টেনে নিয়েছে।

ক্যারিলের মৃত্যুতে আসলে অন্ধকারেরই জয় ঘোষিত হল কি না আমি জানিনে। (মে, ১৯৬০)